পুরস্কারের পুরস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক।

"মণিমুক্তা" "হীরা-জহরত" "শয়তানের সুমতি" "কালিদাস"

"দাদুর দরদ" "মৈথিলী" "বুকের বালাই"

প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ

চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন

বজ্-বজ্

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন
বজ বজ

অগ্রহায়ণ—১৩৪৬
মূল্য—বারো আনা

কলিকাতা, ২৭ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটস্থ
সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার
মাতুল মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে-

ইতি—আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

চিথলিয়া
নদীয়া

পুরুষকারের পুরস্কার

প্রথম পরিচ্ছেদ
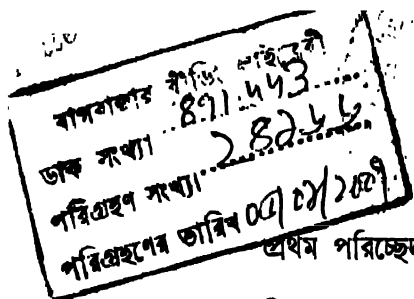
নূতন গ্রামের জমিদারপুত্র, তথাকার নবগঠিত নাট্য-সম্প্রদায়ের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বিপুলবাবু বন্ধুসহ একদিন অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী প্রাচীন নাট্যকার ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটকে কুশধ্বজের ভূমিকা কাহাকে দেওয়া যায় ঠিক করিতে না পারিয়া পাড়ায় পাড়ায় যখন উপযুক্ত বালকের অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে পথের ধারে ধূলায় বসিয়া একটি জোড়াতালি দেওয়া শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অর্দ্ধ নগ্ন বালককে কাঠি সহযোগে একটি শূন্য টিনের বাক্স, তাল লয় সহকারে বাজাইয়া তাহার স্বরচিত অর্থহীন গান সুমধুর কণ্ঠে গাহিতে দেখিয়া ও শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাল, মান, সুর প্রভৃতি বালকটি যেন সহজাত সংস্কার বশতঃই প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই বিপুলবাবুর মনে হইল।

কোন্ শুভমুহূর্ত্তে কে যে কাহার চোখে পড়িয়া যায়

তাহা কে বলিতে পারে ? বালকটির ভাব ভঙ্গি, আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বিপুলবাবু একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই বালকটির দ্বারা কুশধ্বজের অংশ অভিনয় করাইলে কেমন হয় ? কেমন আবার হয়! তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'বেশ ভালই হয়, অতি উত্তম হয় !'

কথাটা মনে হইবামাত্র তিনি বালকটির নিকটে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খোকাবাবু, তোমার নামটি কি একবার বল না গো !"

খোকা বলিল,—"আমি কি খোকা ? আমি তো ছিষ্টিধর !"

"ও ! তুমি খোকা নও—সৃষ্টিধর ! তা' তুমি কা'দের সৃষ্টিধর গো ? তোমার বাবার নাম কি ?"

বালক বলিল,—"আমার তো বাবা নেই—মারা গেছেন। তবে তেনার নাম ছিলেন—চক্কোধর।"

"ও ! তুমি চক্রধরবাবুর ছেলে—হলধরবাবুর ভাই-পো ?" বালক স্বীকৃতিসূচক শির সঞ্চালন করিল।

"তা' বেশ ! পাঠশালায় পড় বুঝি ? কি বই পড় ?"

"পড়ি না তো ! আমরা যে খুব গরীব গো ! পড়া-শুনো ক'রতে নাকি অনেক পয়সা লাগে। কোথায় পা'ব তা' আমরা ?"

বিপুলবাবু বুঝিলেন, তবু বলিলেন,—"কেন তোমার কাকা দেন না? তাঁ'র অবস্থা তো মন্দ নয়!"

দুঃখের মত শিক্ষক বোধ হয় অল্পই আছে। তবে দুঃখ এই যে সেখানে বেতন দিতে হয় অত্যধিক। অন্য কোন পাঠশালায় না পড়িলেও, এই দুঃখের পাঠশালায় পাঠ করিয়া, এই বয়সেই বালক অনেকখানি শিখিয়াছে দেখা গেল। সে ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—"তিনি আর কত দেবেন? মাকে ও আমাকে খেতে প'রতে দেন, তারপর আবার—"

বালকটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বিপুলবাবু ব্যঙ্গ হাস্যে বলিয়া ফেলিলেন,—"খেতে কি দেন তা' অবশ্য জানি না, কিন্তু প'রতে যা' দেন, তা' তো তোমার পোষাকের বাহার দেখেই বুঝ্‌তে পারছি।"

বালক দুঃখপূর্ণ স্বরে বলিল,—"তা' কি ক'রবে বলুন! তেনার নিজের ছেলে ওষ্ঠাধর আছেন যে! তা'কেও তো দেখ্‌তে হবেন তেনাকে!"

"তা' হ'বে বই কি! নিশ্চয়ই হ'বে। তা' তা'র নামটা কি ব'ল্‌লে—ওষ্ঠাধর? বাঃ! বেশ নাম তো! হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

"না, না, সে আমার মত নয়কো! সে ভাল ছেলে,

পাঠশালে পড়ে—কত কত বই! তা'র কত কাপড়-চোপড়! পাঠশালে তো ছেঁড়া কাপড়চোপ প'রে যাওয়া চলে না।"

বিপুলবাবু বলিলেন,—"না, তা'কি চলে, আচ্ছা সে যা'ক্! তুমি লেখাপড়া ক'রবে?"

"ক'রতে পারলে তো ভালই হ'তো, কিন্তু কি ক'রে—"

"সে জন্যে তোমাকে ভাব্তে হ'বে না। আমি কাল তোমাকে পাঠশালে ভর্ত্তি ক'রে দোব! কাল দুপুরে তুমি রাঙাবাবুদের বাড়ী যেও—বুঝ্লে? তারপর যা' ক'রতে হয় আমি ক'রবো।"

বালকটি আহ্লাদে গলিয়া গিয়া বলিল,—"আপনি কি বাবুদের বাড়ীর বাবু?"

বাবু সহাস্যে বলিলেন,—"আমি যেই হই না, আমি যা' বল্লুম তা' ক'রবে তো?"

"আচ্ছা!"

অতঃপর যাহা করিবার বিপুলবাবু সত্য সত্যই তাহা করিলেন, অর্থাৎ বিপুলবাবুর করুণায় বালকটি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই বালকটির অপূর্ব্ব

মেধা শক্তির পরিচয় পাইয়া পাঠশালার শিক্ষকগণও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন।

সে বৎসর যদিও 'নরমেধ যজ্ঞের' অভিনয় বন্ধ রহিল কিন্তু পরের বৎসরে সৃষ্টিধরকে দিয়া বিপুলবাবু কুশধ্বজের ভূমিকায় এমন অভিনয় করাইলেন যে নূতন গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে এরূপ সুন্দর অভিনয় তাহারা জীবনে আর কখনও দেখে নাই।

সে যাহা হউক সৃষ্টিধর যে কেবল অভিনয়েই শ্রেষ্ঠ হইল, তাহা নহে, পড়াশুনাতেও সে শ্রেণীর সর্ব্ব প্রথম হইয়া প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিল; তাহাতে বাহিরে সে যতই প্রশংসা প্রাপ্ত হউক না কেন; গৃহে টিঁকিয়া থাকা তাহার ক্রমশ দায় হইয়া উঠিল।

"কেন?"

তাহা বলিতে হইলে এই পরিবারের পূর্ব্বপরিচয় একটু বিবৃত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চক্রধর ও হলধর দুই সহোদর। চক্রধর কি করিয়া যে মা-বাপ হারা ছোট ভাই হলধরকে মানুষ করিয়াছিলেন তাহা গ্রামের সেকেলে লোক অনেকেই জানেন; আর জানেন যাঁহার চক্ষু কিছুই অতিক্রম করে না, সেই উপরের দেবতা।

সৃষ্টিধর, চক্রধরের অধিক বয়সের সন্তান। প্রথম বয়সে সন্তানাদি কিছু না থাকাতেই বোধহয় ভ্রাতা হলধরের উপরই তিনি তাঁহার সমস্ত স্নেহ একেবারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন। পরে যখন সৃষ্টিধর জন্মগ্রহণ করিল তখনও সে স্নেহের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না।

গ্রামের মাতব্বরগণ দেখিয়া শুনিয়া চক্রধরকে উপদেশ দিতে ত্রুটি করিলেন না,—"ভায়া হে, এইবার একটু বুঝে সুঝে চল, যা' হোক একটা 'গুঁড়োগাড়া'

হয়েছে, তা'র মুখের দিকে চেয়েও এখন থেকে একটু সমঝে চ'ল্‌তে হয়।”

চক্রধর তাহার বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব হাস্যের মধুরেখায় বিমণ্ডিত করিয়া বলিলেন,—“আমার হলা মানুষ হ'য়েছে, আর আমার ভাবনা কি বলুন? ওই ওর ভাইপোকে রাজার হালে রাখতে পারবে।”

পুত্রের রাজার হাল দেখিবার পূর্ব্বেই কিন্তু একদিন বেহাল হইয়া সংসারের হাল হইতে তিনি আপন স্কন্ধ একেবারে খুলিয়া লইয়া এমন স্থানে গমন করিলেন, যেস্থান হইতে সহস্র ক্রন্দন ও বিলাপেও আর কেহ ফিরিয়া আসে না।

তা' না আসে নাই আসুক। ক্রন্দন ও বিলাপের ত্রুটি হইল না। সৃষ্টিধর 'বাবা, বাবা' করিয়া বাড়ী ফাটাইবার উপক্রম করিল; বোধহয় হলধরের চক্ষেও এক ঝলক অশ্রু দেখা দিতে বিস্মৃত হইল না। আর সৃষ্টিধরের মাতার নয়নে সেই হইতে যে সরোবরের সৃষ্টি হইল, আজিও তাহা শুষ্ক হইল না।

চক্রধর তো স্বর্গগত হইলেন। ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে হলধরই এখন খাইতে পরিতে দেয়। স্ত্রীর একান্ত অনুরক্ত হইলেও এবং তাহার স্ত্রীর সহস্র ইচ্ছা

সত্ত্বেও কিন্তু সে ভ্রাতৃবধূ বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে গৃহ হইতে এখনও বিতাড়িত করে নাই। সৃষ্টিধরের মাতা একা যাহা খাটিবেন, মাহিনা করা তিনটা দাসীও তাহা খাটিতে সমর্থ হইবে না। আর সৃষ্টিধরই কোন্ বসিয়া থাকিবে, তাহাকেও ইচ্ছামত খাটাইয়া কার্য্যের অনেক সুসার করিয়া লওয়া চলিবে।

নিন্দুকে, চক্রধর কথিত 'রাজার হালে'র কথাটা লইয়া মাঝে মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করে, কিন্তু সব কথায় কান দিতে হইলে সংসার অচল হইয়া পড়ে। "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই,"—একথা সংসারে কাহারই বা অজ্ঞাত! তথাপি হলধর কি ভাহাই হইয়াছে? এই কলিকালে শতকরা নিরানব্বই জন ভাই, ইহার অধিক অপর কিছু করে কি? তবে জমিজমায় দাদার কিছু অংশ আছে। জমিজমার—খরচ, খাজনা, হাজাশুকো, বাকী বকেয়া প্রভৃতি কত রকমারী 'ফ্যাচাং' বর্ত্তমান আছে। কয়জন তাহা জানে বা তাহার খোঁজ রাখে! ইহার পরও জমিতে ভোগ করিবার মত কিছু থাকে কি,—যে ঘরে আসিবে?

চালুনীর স্বভাব সূঁচকে নিন্দা করা, তা' করুক! তাই বলিয়া হলধর সমস্ত বিলাইয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া গাছতলায় দাঁড়াইবে নাকি? আব্দার মন্দ নয়!

সে যাহা হউক দুঃখে কষ্টে সৃষ্টিধরদের এতদিন একরূপ চলিতেছিল কিন্তু স্কুলে প্রবেশের পর তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালকরূপে পরিগণিত হইবার পর হইতে ওষ্ঠাধরের মাতা তাহাদিগের প্রতি একেবারে চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

ওষ্ঠাধর লেখাপড়ায় একেবারে 'মা-গোঁসাই'। হলধর-পত্নীর দুঃখ এই যে তাঁহার পুত্র লেখাপড়ায় ভাল না হইয়া, হইল কিনা ওই ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলে সৃষ্টিধর! তাই কারণে অকারণে যখন তখন সে 'মাতা' ও তাহার পুত্রের প্রতি মারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বদা তিরস্কার ভর্ৎসনায় তাহাদিগকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া নিজের গায়ের জ্বালা মিটাইতে লাগিলেন। সৃষ্টিধরকে পাঠশালা হইতে নাম কাটাইয়া আনিবার জন্যও তিনি তাঁহার স্বামীকে অনুরোধ করিতে ত্রুটি করিতেন না কিন্তু জমিদার পুত্রের ভয়ে হলধর অতটা সাহস করিলেন না। ইহাতে তাঁহার পত্নীর ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং সেই ক্রোধের ফলে সৃষ্টিধর এবং তাহার মাতার প্রাণ সর্ব্বদা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকিলেও তাহারা নীরবে সকলই সহ্য করিতে লাগিল। ইহা ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে? নিরুপায় বলিয়াই এই সেদিন

যখন তাহার স্নেহময়ী খুড়ীমার বদন বিবর হইতে বচন-সুধা নির্ঝরের মত ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল তখন সেই সুশীতল বারি আকণ্ঠ পান করিয়া সৃষ্টিধর ও তাহার মাতা নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে নির্ঝর ঝরিতেই লাগিল,—"বাপ্‌ রে বাপ্‌! কি দস্যি ছেলে বাপু! মার খেয়ে খেয়ে গলা দিয়ে রক্ত উঠে গেল, তবু কি ছাই ঘাট্‌ মান্‌বে। আর তো পারাও যায় না! মার্‌তে মার্‌তে হাত যে আমার ছিঁড়ে, খ'সে গেল—তবুও না! আহা অমন সুন্দর শ্বেত-পাথরের বাটিটা গো! সেবার 'তেথ্থ' ক'রতে গিয়ে গয়া থেকে ওটাকে এনেছিলুম। এ পোড়াবরাতে আর কি কখনও যাওয়া হ'বে যে আবার একটা আন্‌বো? তবু ব'ল্‌বি—ভাঙ্গিস্‌ নি, ভাঙ্গিস্‌ নি-ই-ঈ?"—বলিয়াই তিনি প্রহার চালাইতে লাগিলেন। তারস্বরে এতগুলি কথা ও প্রহার যুগপৎ চলিতে থাকায় দম আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? এক সময় উহা ফুরাইয়া আসিলে সৃষ্টিধরের খুল্লতাত পত্নী একটু থামিলেন। নাসিকাকে একটুখানি ব্যায়াম করিবার অবসর দিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"আর তা' হ'বেই বা না কেন? বলে—'যেমন গাছ তা'র তেমনি ফল!' তা' বেশ! বেশ! ছেলেটিকে শিক্ষা সহবৎ তো এখন

থেকেই দিচ্ছ বেশ! কা'র কি বল না—শেষ অবধি ভুগতে তো নিজেকেই হ'বে। একখানা থালাবাটি ভেঙে দিয়ে আর আমাকে পথে বসাতে পারবে না। নিজেকেই ব'সতে হ'বে। বলে—ব'সে তো আছই, আরও ব'স্তে হ'বে। এখনি হ'য়েছে কি? এই তো কলির সবে সকাল, এখনও সন্ধ্যে হ'তে অনেক বাকী।”

গাছের দিক হইতে কিন্তু কোন জবাবই আসে না। উষ্মার মাত্রা, উত্তর আসিলেও বাড়ে, না আসিলেও বাড়ে, তাই পিঠে কুলো বাঁধিয়া ও কানে তুলো গুঁজিয়াই গাছের দিন কাটে।

ও পক্ষের মেজাজ তাহাতে ক্রমশ পর্দ্দার পর পর্দ্দা চড়িয়া যায় এবং বচনরাশি উদ্গীর্ণ হইতে থাকে,—“এদিকে তো মায়ের মুখে সাত চড়ে রা বার হয় না। বলে,—‘মিট্‌মিটে শয়তান ছেলে খাবার ডান!’ অত আদিখ্যেতা আমার এখানে পোষাবে না হ্যাঁ! তা' আগেই ব'লে রাখছি। নবাব-নন্দিনীর কথা কইতে ঘেন্না হয়। হাতের ব্যথার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম! সেই থেকে ব'কে ব'কে যে মুখে ফেনা উঠে গেল, তা'কি একটু নরম হ'য়ে ক্ষমা চেয়ে বলবে,—‘আহা তাইতো!’ তা' নয়। রাজ-নন্দিনীর আদিখ্যেতা দেখে ‘গা'টা আমার জ্বলে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল।”

এতক্ষণে গাছের মুখ খুলিল,—"আমি ঘাট্ মান্‌ছি বোন্, ক্ষমা চাচ্ছি।"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল,—"কি, বোন্? আমি ওই ঘুঁটে কুড়ুনীর বোন্? 'আস্পদ্দা'র কথা শুনে' আর বাঁচি নি! যে খেতে পায় তো প'রতে পায় না, সে বলে আমায় বোন্। বেঁচে থাক্‌লে আরও কত শুনতে হ'বে—মরণ তো আর হ'বে না আমার।"

গাছ বলিলেন,—"তবে কি ব'ল্‌বো?"

আরও এক পর্দ্দা চড়া সুরে উত্তর, ঝঙ্কৃত হইয়া কর্ণ-কুহরে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল, "আহারে কথা শুনে' ম'রে যাই আর কি! আমি ব'লে দোব তবে রাজ-নন্দিনী দয়া ক'রে ব'ল্‌বেন? কেন? আমি কি কা'রও মাইনে করা দাসীবাঁদী যে কখন কে কি ব'ল্‌বেন, তা'র কথা জুগিয়ে দেবার জন্যে আমাকে সব সময় তটস্থ হ'য়ে থাক্‌তে হ'বে। আদিখ্যেতা দেখ না,—অত অসৈরণ' আমি ব'লেই সই, আর কেউ হ'লে একদণ্ডও তা' সইতো না। আমারও সইবার তা' ব'লে, সীমা আছে কিন্তু—তা' আগেই ব'লে রাখ্‌ছি, হাঁ!"

গাছের মুখ পুনরায় বোধ হয় বন্ধ হইল। গাছের দিক হইতে কোনই উত্তর আসিল না।

কিছুক্ষণ দম লইবার পর এদিক হইতে পুনরায় মধু-বৃষ্টি আরম্ভ হইল,—"মুখ যে একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল—রাজনন্দিনীর! দাসীবাঁদীর সাথে কথা কইতে যদি ঘেন্নাই করে, তবে কইতে আসাই বা কেন? তবু মুখে র়া নেই—যেন একটা সং! আর অমন সংএর মত মায়ে 'ব্যাটা'য় দাঁড়িয়ে না থেকে সাম্‌নে থেকে স'রে গেলেই তো হয়—দূর ক'রে দিলে যখন দূর হ'বার নাম নেই। দূর আর কি ক'রে করে তা' তো জানি নি—জ্বালাতন!"

অতঃপর গাছ ও ফল হলধর-গৃহিণীর সম্মুখ হইতে দূর হইল—গৃহ হইতে তো আর দূর হইবার উপায় নাই। মাতা ও পুত্র ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদিগের বাস-কোটরের অন্ধ কোণে আশ্রয় লইল।

বাড়ীর ভিতরকার সবচেয়ে ওঁচা, আলো বাতাসহীন স্যাঁত্ সেঁতে সেই মহাকোটরটির বিশদ বর্ণনা না হয় নাই করিলাম। গৃহের কুকুর বিড়ালও বোধ হয় সেই স্থানে থাকিতে আপত্তি প্রকাশ করিত, কিন্তু মাতা পুত্র কোন মুখে অমত করিবে? তাহারা যে কুকুর বিড়ালের অপেক্ষা অধম! কোটরটি বোধ হয় কোন সময়ে কাঠ কয়লা প্রভৃতি রাখিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজ পূর্ব্বোক্ত কাঠ কয়লাও বোধ হয় প্রমোশান পাইয়া উচ্চ

শ্রেণীতে অর্থাৎ কক্ষে স্থান পাইয়াছে। আর তাহাদের পরিবর্ত্তে গাছ ও ফল আসিয়া সেই স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে এবং সেই স্থানেই কয়েকটা বৎসর পরম আরামে কাটাই-য়াও দিয়াছে। বৃক্ষতল অপেক্ষা নিশ্চয়ই উহা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল; তবে আর কি চাই?

এই পরম প্রীতিপদ কক্ষে প্রবেশ করিতেই মাতার এতক্ষণের নিরুদ্ধ অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে পুত্রকে বলিলেন,—"আমার কথা না শুনে' যখন তখন আমার অজ্ঞাতে, আমাকে লুকিয়ে আমার কাজের সাশ্রয় ক'রতে কেন তুই যাস্ বাবা! একটু পরে থালা বাটিগুলো আমিই পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে আস্‌তে পারতুম! এর চাইতে কি তা'তে বেশী কষ্ট হ'ত বাবা! আর তুই ছেলেমানুষ, তুই কি ওসব পারিস্? গুরুবল তাই একখানার উপর দিয়েই গিয়েছে—আরও দুই একখানা যদি ভাঙ্‌তো?"

পুত্র বলিল,—"আর বেশী কি হ'ত মা, কাকীমা তো কিছুই বাকী রাখেন নি যে বেশী ভাঙ্‌লে অবশিষ্টটুকু তিনি পুষিয়ে নিতেন। ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি মা, কিন্তু—"

মাতার কণ্ঠে উষ্মার আভাষ প্রকাশ পাইল,—"ছিঃ! বাবা, গুরুজনকে মান্য ক'রে কথা কইতে হয়। জিনিষ-

পত্র নষ্ট হ'লে, মানুষের রাগ তো হ'তেই পারে। তুমি তা'র সাধের বাটিটা ভেঙে অন্যায় তো সত্যিই ক'রেছ।"

মাতার মৃদু তিরস্কারে পুত্র এবার কাঁদিয়া ফেলিল,—"তোমার কাছে আমি মিথ্যা ব'ল্‌ছি নি মা, সত্যি আমি ভাঙি নি—ভেঙেছে ওটাকে ওষ্ঠা!

"সেকি ক'রে ভাঙ্‌লে?"

"আমি পুকুরের চাতালে ব'সে বাসন মাজ্‌ছিলাম আর ও পুকুরের পাড়ে বল খেলা ক'রছিল। এমন সময় বলটা এসে খুব জোরে বাটিটার ওপর প'ড়তেই, বাটিটা গেল ভেঙে। আমি সে কথা ভয়ে কাকীমাকে ব'ল্‌তে পারলুম না, বল্‌লে কি তিনি বিশ্বাস করতেন?"

"বিশ্বাস করলে তো ওষ্ঠাকে তিরস্কার করতে হত। একজনকে তিরস্কারের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নির্য্যাতন ভোগ করা অপৌরুষের কাজ নয়। তা' না ব'লে তুমি এমন মন্দ আর কি ক'রেছ!"

"মন্দ তো করি নি, কিন্তু তা'র জন্য কত মা'র আর কি গালাগালি খেলুম্‌—দেখ্‌লে তো।"

মাতার কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল। তিনি পুত্রের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"জগতে বড় হ'বার সম্ভাবনা যা'দের ভেতর লুকিয়ে থাকে, তা'রাই

জগতে নির্য্যাতিত হয় বাবা! তোমার পড়ার বইয়ের ভেতরে যে সব মহাপুরুষদের জীবনী দেখ্‌তে পাও, তাঁ'রা যে সবাই অনেক কষ্ট সহ্য ক'রেই বড় হয়েছিলেন বাবা, তাঁ'রা যদি কষ্টে ভেঙে প'ড়তেন, তা' হ'লে কি তাঁ'রা আজ এত বড় হ'তে পারতেন, না সকলের এত পূজা পেতেন? তুমিও সব দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে সহ্য ক'রে দশের একজন হবে, তোমার মা তোমার উপরে সেই আশাই যে বরাবর রাখে বাবা, তোমার মায়ের সে আশা কি সফল হ'বে না মাণিক?"

"তোমার ছেলে তোমার উপদেশ প্রাণপণে পালন ক'রতে চেষ্টা ক'রবে মা!"

একটু থামিয়া পুনরায় সৃষ্টিধর বলিল,—"আমার নিজের কষ্ট আমি সব সহ্য ক'রতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট যে আমি মোটেই দেখ্‌তে পারি না মা, তা'তে যে আমি মৃত্যুর চেয়েও বেশী যন্ত্রণা ভোগ করি।"

মাতা পুত্রের মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া পুলকোচ্ছল কণ্ঠে বলিলেন,—"তোর এই রকম কথায় যে আমার সব জ্বালা, কষ্ট গ'লে জল হয়ে যায় বাবা, যা'র এমন সোনার চাঁদ ছেলে আছে তা'র আবার কিসের দুঃখ কিসের যন্ত্রণা! সে ভিখারিণী হ'লেও যে রাজার জননী। এক-

দিন তুই মানুষের মত মানুষ হ'বি, সেই আশায় তোর মা, সহস্র দুঃখ কষ্টকেও হাসি মুখেই বরণ ক'রে নেবে। তা'র জন্যে তুই ভাবিস্ নি। তা'র নিজের সহস্র কষ্টও সে সহ্য ক'রতে পারবে—তোর কষ্টই যে তা'র সহ্য হয় না মাণিক।"

মাতা ও পুত্রের উভয়ের চক্ষু ফাটিয়া এই সময় অজস্র ধারায় ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু-ভাগীরথীর পবিত্রধারায় তাঁহাদিগের বুকের আগুন ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিল কি? কিন্তু না, এ যে রাবণের চিতা! নিবিবার উপায় কোথায়? এ যে ধিকি ধিকি জ্বলিতেই থাকে। নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম দেখিলেই অদৃষ্ট নির্ম্মম হস্তে উপরকার ছাই ঝাড়িয়া পুনরায় অগ্নিকে উস্‌কাইয়া দেয়।

মাতাপুত্র উভয়েই বোধ হয় আপন আপন কল্পনার কোন এক মায়াময় চিত্রের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এতক্ষণ নীরবেই কোন এক কল্পলোকেই বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব কাংস্যকণ্ঠের সুমধুর বজ্রহুঙ্কারে, নিস্তব্ধতার কর্ণপটহ ছিন্ন হওয়ায় সে বোধ হয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মাতাপুত্রের আলস্য-বিলাসের পরিসমাপ্তি ঘটিতে তখন আর একমুহূর্ত্তও বিলম্ব ঘটিল না।

কাংস্যকণ্ঠ তাহাদিগের কর্ণবিবরের মধ্য দিয়া একেবারে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল,—"বলি, ছেলে নিয়ে সোহাগ আর কতক্ষণ চ'লবে গো ? তা'র কি আর শেষ হ'বে না ! কাজকম্মগুলো মিটিয়ে সোহাগ ক'রলেই তো দেখ্‌তেও ভাল দেখায়, শুন্‌তেও ভাল শোনায় ! শুধু নিজের দিকটা দেখ্‌লেই তো আর সংসার চলে না ; যা'র খাও পর তা'র মুখের দিকেও মাঝে মাঝে চাইতে হয়। আমার কি দশটা চাকর চাকরাণী আছে না কি আছে, যে রাজ-নন্দিনী সব সময় ব'সে ব'সে ছেলেকে সোহাগ ক'রলেই আমার সংসার গড়্ গড়্ ক'রে চ'লে যা'বে ? আর ধন্যি মা বটে ! কোথায় অমন বজ্জাত্ ছেলেকে একটু শাসন সহবৎ শিক্ষা দেবে, তা' নয়। ব'সে ব'সে কেবল আদর আর সোহাগ। তবু যদি পরের গলগ্রহ না হ'তেন। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই তার কুলোপানা চক্কোর।' ঝাঁ্যাটা মার ! ঝাঁ্যাটা মার ! অমন মা-বেটার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়, তবে গায়ের জ্বালা যায়। আমরা কি আঁটকুড়ো—আমাদের কি আর ছেলেপুলে নেই নাকি ? কিন্তু আমরা তো কই অমন বাজে 'নাই' দিয়ে মাথায় তুল্‌তে কখন শিখিনি বাবা !"

এক সঙ্গে এতগুলি কথা একটানা গড় গড় করিয়া

যেন মুখস্থ বলিবার পর কাংস্যকণ্ঠের দম বোধ হয় ফুরাইয়া আসিল, তাই তিনি নিবৃত্ত হইলেন।

সৃষ্টিধর এতক্ষণ যেন সম্মোহিত হইয়া গিয়াছিল, এইবার সম্বিত ফিরিয়া পাইলে সে দেখিল—ইতোমধ্যে কখন যে তাহার মাতা চলিয়া গিয়াছেন তাহা সে লক্ষ্যই করিতে পারে নাই। সে তখন তাহাদিগের ছিন্নমাদুরের রাজশয্যার উপরে আপন দেহ ঢালিয়া দিল। কোথায় ছিল সাত সাগরের সমস্ত জল—তাহারা যেন পাল্লা দিয়া কেবলই তাহার চক্ষুতে একসঙ্গে আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময়ে সে নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

নিদ্রার মধ্যে সে পরম তৃপ্তিপূর্ণ এক অতিশয় মনোরম স্বপ্ন দেখিল। সে দেখিল,—তাহার পিতার যেন মৃত্যু হয় নাই। তিনি বিদেশে কোথায় যেন এতদিন ছিলেন, আজ অপূর্ব্ব সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া প্রকাণ্ড একখানি সুন্দর গাড়ীতে চড়িয়া তাহাকে যেন লইতে আসিয়াছেন। সে তাহার মাতাকে ডাকিতে চাহিলে, তাহার পিতা, হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"তা'র জন্য কোন চিন্তা নেই, তোমার মাতাই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন।"

পিতা অতঃপর চালককে গাড়ী চালাইতে হুকুম করিলেন। অশ্ববিহীন গাড়ী আপনা আপনি চলিতে লাগিল। সৃষ্টিধর অজ পাড়াগাঁয়ে মানুষ। সে কখনও 'মোটার কার' দেখে নাই, তবে সে হাওয়া গাড়ীর গল্প শুনিয়াছে, তবে এই কি সেই হাওয়া গাড়ী? সহসা আপন দেহের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সে বিস্মিত হইয়া গেল। কোথায় গেল তাহার সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। এ যে বহুমূল্য বেশভূষায় তাহার অঙ্গ সুসজ্জিত। আশ্চর্য্য!

হাওয়াগাড়ী ছুটিতেছে। হঙ্ক হঙ্ক করিয়া শিঙ্গা বাজাইয়া বোঁ বোঁ করিয়া ছুটিতেছে। কত খাল, বিল, নদী, মাঠ, পাহাড়, পর্ব্বত, কুটীর, প্রাসাদ প্রভৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া হাওয়াগাড়ী সত্য সত্যই যেন হাওয়ায় উড়িয়া ছুটিতে লাগিল। কত রকমের অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৃশ্যই না সে দেখিল যাহা সে কোন ভূগোল বা গল্পের বইতেও পড়ে নাই। ভূগোল ও ভ্রমণ কাহিনীর স্থান-গুলি মিলিয়া মিশিয়া এ যেন অপরূপ সব নব নব মায়া-রাজ্যের দৃশ্যসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী অবশেষে থামিল। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া প্রাসাদের অধিবাসী অনেকেই ছুটিয়া আসিল।

পিতার হাত ধরিয়া সৃষ্টিধর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখে চাহিতেই দেখিল তাহার মাতা দাঁড়াইয়া আছেন। সৃষ্টিধর অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল,—"মা কখন এলেন? আর কি করেই বা এলেন?"

মাতা যেন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই হাসি মুখে বলিলেন,—"চল্ ঘরে চল্। আগে জামা জুতো ছেড়ে একটু বিশ্রাম কর। পরে সবই শুন্‌তে পাবি। এখন চল্‌তো।"

সৃষ্টিধর মাতার নির্দ্দেশক্রমে একটি কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইয়া, কক্ষস্থিত একটি আসন গ্রহণ করিল। চমৎকার! এমন সাজ সজ্জায় সজ্জিত কক্ষ সে কখন ইহার পূর্ব্বে চক্ষেও দেখে নাই। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ, এই সব অপূর্ব্ব আসবাব কাহার? তাহাদের কি?

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া মাথার উপরকার বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়া দিল। আঃ, কি আরাম! এ সব কি আলাদিনের আশ্চর্য্য মায়া প্রদীপের সাহায্যে সংঘটিত হইতেছে! কে জানে?

সৃষ্টিধর, এ সম্বন্ধে মাতাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার দিকে চাহিতেই দেখিল,—একজন ভৃত্য সাবান, তৈল, তোয়ালে, কাপড় প্রভৃতি লইয়া

উপস্থিত হইল এবং জিনিষগুলি সাবধানে নামাইয়া রাখিয়া সসম্ভ্রমে সৃষ্টিধরের অঙ্গ হইতে জামা, জুতা প্রভৃতি খুলিয়া লইল। অতঃপর তৈলের শিশি হইতে তৈল লইয়া তাহার মস্তকে মাখাইতে আরম্ভ করিল। আঃ! কি মনোহর সুমিষ্ট গন্ধ!

সৃষ্টিধর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল,—সে কি একদিনে আবুহোসেন বনিয়া গেল না কি?

হঠাৎ ভৃত্যের হস্ত হইতে শিশিটি মেঝের উপর পড়িয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। সেই শব্দে সৃষ্টিধরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চোখ মেলিতেই সে দেখিতে পাইল,— ওষ্ঠাধর দ্রুতপদে পলাইয়া যাইতেছে। সে অমন করিয়া কেন ছুটিয়া চলিয়া গেল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত মনের অবস্থা তখন মোটেই সৃষ্টিধরের ছিল না। সে কেবল ভাবিতে লাগিল,—"ওঃ! এতক্ষণ তবে স্বপ্ন দেখছিলুম! একেই বুঝি বলে,—'ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে কাঙ্গালের ছেলের লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা!' কিন্তু ঠিক সেই স্বপ্নের সুগন্ধি তৈলের গন্ধের ন্যায় গন্ধ তো এখনও নাকে আস্‌ছে।" হঠাৎ মাথায় হাত দিয়া সে বুঝিতে পারিল যে তাহার শুষ্ক কেশ, তৈলে একেবারে জবজব করিতেছে। হাতখানা নাকের নিকট আনিতেই বুঝিতে

তাহার আর এতটুকুও বিলম্ব হইল না যে সেই সুগন্ধ তাহার মস্তকের পূর্ব্বোক্ত তৈলেরই।

সে বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিতেই অদূরে দেখিতে পাইল,—একটি শিশি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে ও শিশিটিকে কেন্দ্র করিয়া খানিকটা স্থান তৈলাক্ত হইয়া রহিয়াছে।

সৃষ্টিধর এতক্ষণে ওষ্ঠাধরের দ্রুত পলায়নের তাৎপর্য্য জলের মত বুঝিতে পারিল। সৃষ্টিধরের নিদ্রার সুযোগ গ্রহণ করিয়া, ওষ্ঠাধর তাহার মাতার মাখিবার কেশতৈল সৃষ্টিধরের মাথায় মাখাইয়া দিয়া বোধহয় কোন শয়তানি মতলব হাসিল করিতেছিল। সহসা হাত ফস্কাইয়া শিশিটা পড়িয়া যাওয়ায়, শব্দে সৃষ্টিধরকে জাগিতে দেখিয়া সে দ্রুত পলায়ন করে। কিন্তু কেন সে এমন করিল? সৃষ্টিধর তাহার কি করিয়াছে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন ও বাস্তবে যে এতখানি পার্থক্য সৃষ্টিধরের তাহা অগ্রে জানা ছিল না। বাস্তবের কঠোর রূঢ় আঘাতে তাহার স্বপ্নের সকল সৌন্দর্য্যই একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। হলধর-গৃহিণীর দ্বারা একবাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে সৃষ্টিধর একজন পরিপক্ক, প্রকাণ্ড তস্কর। যাহার শিল, যাহার নোড়া, তাহারই দাঁতের গোড়া ভঙ্গ করিতে সে এতটুকুও কুণ্ঠিত নহে, অর্থাৎ সে যাহার অন্ন গ্রহণ করে, যাহার বস্ত্র পরিধান করে, তাহারই সে অপহরণ করে। এই বয়সেই যাহার এত বিদ্যা, ভবিষ্যতে আরও খানিকটা যখন সে বড় হইবে তখন সে যে কি হইবে তাহা বলিতে যাওয়া তো দূরের কথা ভাবিতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

যখন সৃষ্টিধরের পেজোমীর পরিচয়টা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়াই পড়িল তখন হলধর-গৃহিণী যে কি কাণ্ড

করিবেন, আর কি কাণ্ড করিবেন না, তাহা ভাবিয়া না পাইয়াই বোধহয় এমন সব কাণ্ড করিতে লাগিলেন যাহা দেখিয়া গৃহের সারমেয়, মার্জ্জার প্রভৃতিও ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া যে যেখানে পারিল পলাইতে পথ পাইল না! গৃহের কুকুর বিড়ালের পলাইবার পথ খোলা থাকিলেও সৃষ্টিধর ও তাহার মাতার তো কোন পথই মুক্ত নাই, তাই তাঁহারা এই অপূর্ব্ব তর্জ্জন গর্জ্জন, ঝম্প আস্ফালন প্রভৃতি নীরবেই হজম করিতে লাগিলেন।

হলধর-গৃহিণীর গর্জ্জন সমানে চলিতে লাগিল,—"অমন ছেলেকে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেল্‌তে হয়। সখ দেখে মরে যাই, আর বাঁচি নি! বলে,—ভাত খাবার যার ভাত জোটে না, তার গন্ধ তেল না হলে মাথা ধরে,—ঘুম হয় না। উনি নাকি আবার পাঠশালের সেরা পড়ুয়া! লেখাপড়া ক'রে যদি এই বিদ্যে হয় তবে ওষ্ঠাধর আমার সাতজন্ম যেন লেখা-পড়া না শেখে—তাও ভাল, তাও ভাল, তাও ভাল!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে চপেটাঘাত, কীলবর্ষণ ও কর্ণমর্দ্দন প্রভৃতির অসহ্য পুলকে সৃষ্টিধরের মস্তক, পৃষ্ঠ, কর্ণ প্রভৃতি ঘন ঘন তুষ্ট, হৃষ্ট ও পুলকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের পুত্রের প্রতি জায়ের এই অপূর্ব্ব বাৎসল্য,—

ভাগ্যবতী মাতা পশ্চাৎ ফিরিয়া নীরবেই উপভোগ করিতে লাগিলেন।

পুনরায় তর্জ্জন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল,—"মাথার জ্বালায় দিনরাত জ্বলে মরি, তাই কত বলে কয়ে এক শিশি তেল আনিয়েছিলুম, তা খোশবু মেখে কুকুরের খুশ হল না, সেটা একেবারে ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে তবে খুশী হলেন। বাবারে বাবা! কি বজ্জাৎ, হিংসুক ছেলেরে বাবা! তা আর হবে না? বল্‌তেই বলে,—"যেমন গাছ তার তেমনি ফল।" গাছ ভাবেন যে—'আমার তো মাখবার পরবার কপাল পুড়েছে, ওর কেন পোড়ে না'—এই তো? বুঝি, বুঝি, সব বুঝি! বিদ্বান ছেলের মা না হলেও এত মূখ্যুই আর নই যে এটার মানেও আর বুঝি নি! কিন্তু তা বলে হিংসে করলে আর কি হবে? যে যেমন আর জন্মে তপিস্যে করে এসেছে, এ জন্মে সে তো তেমনি ফল ভোগ করবে! তা ছেলে লেলিয়ে দিয়ে একটা আধটা তেলশুদ্ধ তেলের শিশি ভেঙ্গে আর আমার কপাল ভেঙ্গে দিতে কেউ পারবে না, লাভের মধ্যে নিজের পোড়া-কপালই আরও একটু বেশী করে পুড়বে। একবার বাড়ী এলে হয়। মা-বেটার নাক কান কেটে যদি বাড়ী থেকে না বার করে দি, তো আমার নাম লিখে যেন লোকে

জুতো মারে। আমি তেমন বাপের মেয়ে নই, আমার যে কথা সেই কাজ। অত 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' আমি বুঝি নি। লোকে নিন্দে করবে? লোকের আমি কি ধার ধারি? কারও এক চালায় বাসও করি না, কি কারও ধার করেও খাই নি,—তবে? যারা পরের 'গলগ্রেহ', ভয় করে চলতে হয় তারাই চলবে—আমি না। আগেই বলে রাখছি—এত জ্বালা আমি সইতে পারবো না, পারবো না, পারবো না।" সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিধরের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

"কেন, এত তেজ কেন? আমি বলে মাথার জ্বালায় দিনরাত জ্বলে মরছি, কোথায় মা-বেটা, যে খেতে পরতে দেয় তার জ্বালা কমাবার একটু চেষ্টা করবে, তা নয়! জ্বালা যাতে আরও বাড়ে কেবল তারই চেষ্টা—সব সময়! তেলের শিশিটা ভাঙ্‌বার মানে তা ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে? নিজের জ্বালা! সংসারের জ্বালা! তারপর হিংসুক মা বেটার জ্বালা! আমি আর সইতে পারবো না। কেন সইবো? সইবো না, সইবো না, সইবো না!"—পুনরায় পুষ্পবৃষ্টি চলিতে লাগিল।

তাহাকে কিন্তু সহিতেই হইল। কি জন্য? তাহাই এইবারে বলা হইতেছে।

হলধর বাড়ীতে আসিলে তাহার গৃহিণী তাহাকে যদিও সাতখানা করিয়া উপর্য্যুক্ত ঘটনাটির বিবরণ প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না, তথাপি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া তিনি গৃহিণীর মতে সায় দিতে পারিলেন না। কারণ প্রধানতঃ বিনা মাহিনায় সৃষ্টিধরের মাতার ন্যায় এমন পরিচারিকা আর একটা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া মিলিবে না। উপরন্তু সৃষ্টিধরের দ্বারাও কম কাজ পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া তাড়াইয়া দিলে গৃহ ও জমিজমার অংশও খানিকটা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। গ্রাম তো একেবারে লোকশূন্য হয় নাই। গ্রামের লোকজন কাহারও ভাল করিতে পারুক বা নাই পারুক, মন্দ করিতে তো সর্ব্বদাই পারে এবং সময়ে সময়ে করিয়াও থাকে। হিংসক লোকদিগের স্বভাবই যে ওই—ঘরের খাইয়া বনের মহিষ বিতাড়ন করা! আর নিন্দক লোক-দিগেরও তো দুর্ভিক্ষ পড়িয়া যায় নাই। তাহারা বলিবে কি? অতএব নানাদিক বিবেচনা করিয়া মা-বেটাকে এবারেও বিতাড়িত করা সম্ভব হইল না। তবে হাঁ, যতদূর সম্ভব বা অসম্ভব শাসন করা যাইতে পারে, তাহার তিনি কোনই ত্রুটি রাখিলেন না; তবে বারদিগর এইরূপ হইলে যে মাতা-পুত্রের স্থান তাঁহার গৃহে আর কিছুতেই

হইতে পারিবে না,—এ কথাও বারংবার তারস্বরে ঘোষণা করিতেও কার্পণ্য করিলেন না এবং তাঁহার হস্তের আর এক দফা পুষ্পবৃষ্টিতে সৃষ্টিধরের সারা অঙ্গ আর একবার অসহ্য পুলকে, নন্দিত, ছন্দিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

তা উঠুক! মাতাপুত্র পুনরায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গৃহ ছাড়িয়া যে পথে দাঁড়াইতে হইল না, ইহাই যথেষ্ট!

সে যাহাহউক মাতাপুত্রের দিন এইরূপে একরূপ কাটিয়া যাইতে লাগিল। কে বলে,—দুঃখে মানবের হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। যায় না গো যায় না। তাহা যদি যাইত, তাহা হইলে এই মাতাপুত্রের হৃদয়ও বোধ করি এতদিন চূর্ণ বিচূর্ণই হইয়া যাইত কিন্তু তাহা তো হইল না।

সুখে হউক দুঃখে হউক মানবের দিন চলিয়াই যায়। কাহারও দিনই পড়িয়া থাকে না। ইহাদের দিনও কাটিতে কাটিতে কয়েক বৎসর মহাকালের বিরাট সমুদ্রে মিশিয়া গেল।

এই কয়েক বৎসরে সৃষ্টিধর খানিকটা বড় হইল। থিয়েটার করিতে আর তাহার ভাল না লাগিলেও সে কয়েকবার থিয়েটারও করিল—কৃতজ্ঞতার খাতিরে।

কারণ থিয়েটারের 'পার্ট' পড়িতে পারিবে বলিয়াই না বাবু তাহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তাই সে নাটক অভিনয় করিতে অস্বীকার করিতে পারিল না। সেইজন্যই সে অভিনয় করিল এবং তাহার ফলে যথেষ্ট বাহবাও পাইল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহবা সে কিন্তু পাইল সেইদিন, যেদিন তাহার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বৃত্তির ফল বাহির হইলে জানা গেল যে সে উক্ত পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে।

যাহা হউক গ্রামের পাঠশালার পড়া তো তাহার শেষ হইল। এখন তাহাকে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইবে। কয়েক টাকা বৃত্তির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া বিদেশে যাইয়া স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া যায় না। তাহার পূজনীয় খুল্লতাত মহাশয়ও রাজি নহেন।

খুড়া মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে অধিক পড়িয়া যে কি হইবে তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আজকালকার বাজারে এম-এ, বি-এর যে কি দর তাহা তো সকলেই বিশেষ ভাবেই অবগত আছে। অতএব সৃষ্টিধরের যাহা হইয়াছে ইহাই তো যথেষ্ট! তাঁহার নিজের পুত্র ওষ্ঠাধর যে ছাত্রবৃত্তির প্রথম শ্রেণীতেও আজ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও

দুঃখিত তো নহেনই বরং খুশীই হইয়াছেন, কারণ এই সব হাঙ্গামার হাত হইতে তিনি রেহাই পাইয়াছেন। প্রতি বৎসর এত এত ছেলে যে পাস করিতেছে তথাপি দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে সে আর কয়জন? তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির অপেক্ষা অশিক্ষিতের সংখ্যাই তো দেশে অধিক; সুতরাং যে দিকটা দলে ভারি, সেই দিকেই তো যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আর লেখাপড়া শিখিলে তো মানুষ গরু হয়। এই যে তিনিও তো বিশেষ কিছু তথাকথিত লেখাপড়া শিখেন নাই,—সাহস যদি থাকে, অগ্রসর হউক তো দেখি কোন 'লিখ্‌নে পড়নেওয়ালা' আছে, তাহার সহিত টক্কর দিয়া যাউক। অতএব অর্থ নষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া গরু হওয়া অপেক্ষা, অর্থ ধ্বংস ও পরিশ্রম, না করিয়া ঘোটক হওয়া কি মন্দ?

পূজনীয় খুল্লতাত মহাশয়ের অকাট্য যুক্তির সারবত্তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিবার উপায় না থাকিলেও হতভাগ্য সৃষ্টিধরের কিন্তু কিছুতেই তাহা মনঃপূত হইল না। সে স্থির করিল, যেমন করিয়াই হউক উচ্চ-ইংরাজী স্কুলে সে ভর্ত্তি হইবেই। তাহার মাতারও তাহাই ইচ্ছা; কিন্তু কোনই উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অদম্য ইচ্ছাশক্তির নিকট কিন্তু উপায় পায়ে হাঁটিয়া দর্শন দিয়া থাকে। সৃষ্টিধরেরও একটা ব্যবস্থা হইল।

নূতন গ্রাম হইতে ক্রোশ তিনেক দূরে প্রদীপপুর গ্রামে আজ কয়েক বৎসর হইল একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রদীপপুরের স্কুল-প্রদীপটি টিম টিম করিয়া কোন প্রকারে জ্বলিতেছে। বালক সৃষ্টিধর একদিন কাহাকেও না বলিয়া কহিয়া প্রদীপপুরের সেই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া আসিল। বৃত্তি পরীক্ষায় সে বৃত্তি পাইয়াছে বলিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সানন্দে তাহাকে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন।

সৃষ্টিধর ভাবিল,—বিদ্যালয়ে যদি বেতন না দিতে হয় তবে বৃত্তির টাকা হইতেই পুস্তক ও অন্যান্য খরচ নিশ্চয় ভাল ভাবেই কুলাইয়া যাইবে। প্রত্যহ ছয় ক্রোশ রাস্তা যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর বটে, তবে তাহাও অভ্যাসের দ্বারা সময়ে সহজ হইয়া আসিবে। অভ্যাসের গুণ সম্বন্ধে একটি রচনায় সে তো ঐ রকম কথাই পাঠ করিয়াছিল। অধীত বিদ্যা কার্য্যে সে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। আর কষ্ট? কষ্ট তো সহ্য করিতেই হইবে। মা বলিয়াছেন বিনা কষ্টে কেহ কখন বড় হইতে পারে

না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। অত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই তো আজ তাঁহার জগৎজোড়া নাম! অতএব কষ্ট দেখিয়া পিছাইয়া গেলে তাহার চলিবে না। যাতায়াতের কষ্ট তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে।

যাতায়াতের কষ্ট ছাড়াও যে আরও বহুবিধ কষ্ট তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, বালকবুদ্ধিতে স্বষ্টিধর কিন্তু তাহা তখন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

স্বষ্টিধরের দ্বারা এতদিন সংসারের যেরূপ সাহায্য হইতেছিল এখন আর সেরূপ হইতে পারিল না; কেননা বালককে অতখানি রাস্তা হাঁটিয়া যাইতে হইত বলিয়া যে সময় সে পূর্ব্বে পাঠশালায় যাইত, এখন তাহার অনেক অগ্রেই গৃহত্যাগ করিত এবং অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিত। তখন কোন কিছু করিতে তাহার হাত পা যেন আর উঠিতেই চাহিত না।

যদিও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া নিজের ও পুত্রের নির্দ্দিষ্ট সকল কাজই তাহার মাতা সম্পন্ন করিয়া দিতেন, তথাপি হলধর-গৃহিণী তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন না এবং উঠিতে বসিতে কথায় কথায় মাতা ও পুত্রকে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

রান্নার ভার সৃষ্টিধরের মাতার উপর ন্যস্ত থাকাতে বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে, অত সকালেও বালকের অন্ন জুটিতে লাগিল; তাহাতে কিন্তু হলধর-গৃহিণী চটিয়া আগুন হইতে লাগিলেন। তিনি সৃষ্টিধরের মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—"সাত সকালে এই যে তাড়া-তাড়ি উঠে ছেলের জন্যে পিণ্ডি রাঁধা হয়,—আর সকলে তা' মুখে দেয় কি ক'রে? ওনার ছেলের হ'লেই তো আর সংসারের সকলের পেট 'শেতল' হ'য়ে যায় না! আরও যে পাঁচজন দাসী বাঁদী সংসারে আছে গো,—তা'রা ওই ঠাণ্ডা জল খায় কি করে তা' একবার ভেবে দেখ্‌তে হয় না! পাড়াগাঁয়ের অসভ্য লোকেরা যে একটু দেরীতেই গিলে থাকে সেটা কি আজও জান না?"

সৃষ্টিধর জননী সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন,—"ওকে চারটি আলাদা ফুটিয়ে দি, সকলের ভাত তো পরেই রান্না হয়!"

হলধর-গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"পরে রান্না হয়! কেন হয়? দু'বার করে রাঁধ্‌তে যে বেশী কাঠ পোড়ে, তা' কোথা হ'তে আসে শুনি? বলি,—যা'র খাও পরো, তার কোথায় সাশ্রয় হয় তা'কি একটুও দেখ্‌তে হয় না? এত অপচয় আমার বাবা এলেও সহ্য ক'রতে

পারবে না, তা' আগেই ব'লে রাখ্‌ছি। উনি পণ্ডিতের মা হ'লে আমার একেবারে 'ছিরিধাম' বৈকুণ্ঠ লাভ হবে কি না? আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনি!"

ইহার পর হইতে সৃষ্টিধরের ভাগ্যে সদ্য রান্না করা ভাত আর জুটিল না। পূর্ব্ব রাত্রির রাখা বাসি কড়কড়া বা পান্তাভাত একমুঠা খাইয়াই তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। তাহাতে সৃষ্টিধর কিন্তু কাতর হইত না। কি করিয়া ভাল ছেলে হইবে, কি করিয়া মাতার দুঃখ ঘুচাইবে, কি করিয়া মাতার সর্ব্ব-কামনা পূর্ণ করিয়া, তাঁহার মনের মত হইয়া দশের একজন হইব—ইহাই তাহার একমাত্র কামনা, ধ্যান ও সাধনা। সে জগতে অপর কিছুই ভাবিয়া দেখিবার সময় পায়না। তাই কোন দুঃখ, কষ্ট তাহাকে যেন আর স্পর্শই করিতে পারে না। মাতৃ-আশীর্ব্বাদ রূপ অক্ষয় রক্ষাকবচে তাহার দেহ যেন সর্ব্বদাই সুরক্ষিত তাই সহস্র নির্য্যাতনের কোন তীক্ষ্ণ শরই যেন সে দুর্ভেদ্য বর্ম্মভেদ করিয়া তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে না। দুঃখ কষ্টে মন যদি কখনও নিতান্তই একটু চঞ্চল হইয়া উঠে তখন সে, যাঁহার কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে,—অসম্ভবও সম্ভব হয়, সেই সুখ-দুঃখের বিধানকারীর নিকট শক্তি প্রার্থনা করে,—

"ভগবান, দয়া কর! শক্তি দাও প্রভু, শক্তি দাও! শক্তি দাও!"

অমনি তাহার প্রাণ সবল হইয়া উঠে। সত্য সত্যই প্রাণে সে অদম্য শক্তি লাভ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাহা হউক সুখে দুঃখে সৃষ্টিধরের দিন এক প্রকারে চলিতে লাগিল। সুখের কথা এই যে এখানেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও শীঘ্রই তাহার লেখা-পড়ার প্রতি মনোযোগ ও সর্ব্ব-বিষয়ে সদাচার দেখিয়া তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। আর দুঃখ? সাগরে তো সে শয়ন করিয়াই আছে অতএব শিশির দেখিয়া ভয় করিলে তাহার চলিবে কেন? কিন্তু শিশিরও তো তুচ্ছ নয়। এই বিন্দু বিন্দু দুঃখের শিশিরও যে অশেষ হইয়া মিলিত হইয়া অবশেষে ভীষণ মহা-দুঃখের এক মহাসাগরের সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিতেছে।

বৃত্তি পাইবার পর হইতে তাহার পূজনীয় খুল্লতাত মহাশয়, সমান্য অন্নজল ভিন্ন তাহাদিগের জন্য অন্য সর্ব্ব-প্রকারের ব্যয় বাহুল্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন; অর্থাৎ আগে যে এক আধখানা 'ছেঁড়া খোঁড়া' পরিত্যক্ত

কাপড় মাঝে মাঝে তাহাদিগকে প্রদান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, এখন সেই মহালোভও তিনি নিষ্কামভাবে ত্যাগ করিয়াছেন বরঞ্চ সৃষ্টিধর কেন যে সেই পুণ্য তাহার এই সুসময়ে নিজেই সঞ্চয় করে না, তাহাই ভাবিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা পরি-সীমা থাকে না।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন,—"এতদিন খাওয়ালুম, পরালুম,—এখনও খেতে দিতে হয়, আশ্রয়ও না দিয়ে উপায় নেই। তা'র কি এই পরিণাম? এই যে মাসে মাসে এক কাঁড়ি ক'রে টাকা পাস্ বাপু, তা' কি খুড়ো খুড়ীর নাম ক'রে ছুটো—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই তাঁহার অশেষ গুণ-সম্পন্না বাগ্বাদিনী সহধর্ম্মিণী তাহার বীণার তারে সুমধুর ঝঙ্কার প্রদান করিলেন,—"তবে আর কলিকাল বলেছে কেন? আর তোমারও ধনি্য আশা যা' হোক! আমি তো সাত জন্ম ভাব্‌লেও এমন কথা মনের কোনেও একটু ঠাঁই দিতে পারতুম না যে ওরা আবার কখনও একটা আধলা দিয়েও ইহ-জন্মে আমাদের সুসার ক'রতে পারে। কিন্তু ধনি্য তোমার আশা! আর ধনি্য তোমার ভরসা!"

হলধর বাবু লজ্জিত মুখে একবার 'ঢোক' গিলিয়া লইয়া বলিলেন,—"না, দেখ্‌লে না সেবার প্রণাম ক'রবার ঘটাটা! কি ধড়িবাজ ছেলেই হয়েছে বাপু।"

"ও সেই পেথম মাসে জলপানি পেয়ে, টাকা দিয়ে যে পেন্নাম ক'রেছিল, সেই কথা ব'ল্‌ছো তো? ওঃ! তা' বুঝি বলি নি? সে কথা জানো না বুঝি? টাকা নিয়ে এসে—সব টাকা মায়ের পায়ের কাছে রেখে, গলায় কাপড় দিয়ে, বাছার আমার সে কি পেন্নামের ধুম! যদি দেখ্‌তে তো হেসে আর বাঁচতে না। আমি আড়াল থেকে সবই দেখেছি কিনা, তাই জানি। বাবার দয়ায় 'ওষ্ঠ' আমার ওর চেয়ে বয়সে তো অনেক বড়ই হ'বে, এতখানি বয়েস হ'ল বাছার আমার কিন্তু অমন ঢং ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রতে কখন দেখ্‌লুম না! আর সে এমন মায়ের বেটা নয় যে যা'র তা'র কাছে মাথা নোয়াবে। হাঁ, তুমিই বল না?"

কথাটা শুনিয়া হলধরবাবু কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া, শুধু একবার নয় একসঙ্গে বার কতক 'ঢোক' গিলিয়া লইয়া কি বলিতে যাইয়া তাহা না বলিয়া, সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন কি?

"আরে যাও কোথা? শেষটা শুনেই যাও। কি

ব'ল্‌ছিলুম ?—ওঃ! সেই পেন্নাম! তারপর সেই পেন্নামের ঢং শেষ হ'লে আরম্ভ হ'ল মায়ের আশীর্ব্বাদ আর সোহাগের বাড়াবাড়ি! সে পালা যখন শেষ হ'ল, তখন মা ব'ল্‌লেন,—'যাও তো মাণিক, এক একটা ক'রে টাকা দিয়ে তোমার খুড়ো খুড়ীকে পেন্নাম ক'রে এসো!' তা'তে খুড়ো খুড়ী একেবারে কেতাথ হ'য়ে যা'বেন আর কি ?"

সৃষ্টিধরের খুড়ামহাশয় এইবার কথাটা অনুমোদন করিলেন,—"তা' বটে!"

"বড় তা' বটে নয়! যত সোজা মনে ক'রেছ ওই ফলের গাছকে, উনি তত সোজা নন। ওর মানেটা আর বুঝ্‌লে না ? 'ঐশজ্জি' গো 'ঐশজ্জি' দেখানো। 'দেখ তোমরা দেখ আমরা কত বড় 'নোক' হয়েছি। টাকা ছাড়া পেন্নাম করি নি।' আগে শুধু ছিলেন ভাল ছেলের মা, আর এখন হ'লেন বড়লোকের মা, না জানি কবে বা রাজার জননীই হয়ে ওঠেন।"

এখন তো চক্রধরবাবু জীবিত নাই যে হলধরবাবুর চুপ্ করিয়া বসিয়া দিবারাত্র ভাগবৎ পাঠ শুনিলেই গড় গড় করিয়া দিন চলিয়া যাইবে,—গৃহিণীর যেন সকল কাজ পরিপাটি করিয়া সমাধা করিবার জন্য দিনরাত্রির

বিনা মাহিয়ানার দাসী, সৃষ্টিধরের মাতা বর্ত্তমান আছেন, তাই সকল সময় ভাগবৎ পাঠ করিয়া কাটাইলেও তাহার দিন পড়িয়া থাকে না; হলধরবাবুকে তাই বাধ্য হইয়া উঠিতেই হইল, কিন্তু ভাগবত পাঠ সেজন্য বন্ধ রহিল না, তাহা চলিতেই লাগিল,—"ওঃ! রাজমাতা হ'য়ে গলাটা যেন একেবারে কেটে ফেল্‌বেন আর কি! বলে,—

'হাতী ঘোড়া গেল তল
ভেড়া বলেন,—কত জল?'—

ভয়ে একেবারে মরে গেলুম আর কি!" বলিতে বলিতে এতক্ষণে তিনি শ্রোতার অভাব অনুভব করিলেন নাকি, নতুবা বেদব্যাসকে সাময়িক বিশ্রাম দিলেন কেন?

সে যাহাহউক এসব মানসিক ব্যাপার তো সৃষ্টিধরের মন-সহা হইয়া গিয়াছে কিন্তু শারীরিক দুঃখ এখনও যে গা-সহা হইতে চাহে না। তাহা হইতে এখনও বোধ হয় কিছুকাল সময় লাগিবে!

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি খালি পায়ে ও একপ্রকার খালি গায়েই সৃষ্টিধরকে কাটাইতে হয়। গ্রীষ্মের কাঠ-ফাটা রৌদ্রে পল্লীর মাঠ ঘাট যখন ফুটি-ফাটা হইয়া উঠে তখন মুক্তপদে বালককে স্কুলে যাইবার সময় অতখানি পথ অতিক্রম করিতে যে কতখানি বেগ পাইতে হয় তাহা

তাহার অন্তরাত্মাই বুঝিতে পারে। রৌদ্রে মাথার চাঁদি এবং তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিবার উপক্রম করে ; অথচ মাথা ঢাকিবার তাহার ছাতা নাই। তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য অতবড় মাঠটার কোন স্থানে একবিন্দু জলও মিলে না। পৃথিবীর বুকের সমস্ত আগুন তাহার বুক চিরিয়া বাহিরে কেবলমাত্র সেই মাঠটায় যেন আসিয়া লক লক শিখা বিস্তার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দেয়। সমস্ত মাঠ ধুধু করিতে থাকে। চোখের জলের সহিত গায়ের ঘাম মিশিয়া সৃষ্টিধরকে স্নান করাইয়া দেয়। সে পাততাড়ির আড়ালে মাথা লুকাইয়া কোনরূপে মাথা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। পথের মাঝে মাঝে পত্রহীন এক একটা বৃক্ষ-কাণ্ডকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার নীচে দাঁড়াইয়াও বিশেষ সুবিধা হয় না, কেবল বিদ্যালয়ে যাইতে বিলম্ব হয় মাত্র।

বর্ষাকালে আকণ্ঠবারি পান করিয়া ধরণী শীতল হয়। বৃক্ষাদির দুর্দ্দশা বিদূরিত হয় কিন্তু সৃষ্টিধরের দুর্ভোগ বাড়ে বই কমে না। কর্দ্দমে কর্দ্দমে পথ ধূল পরিমাণ হইয়া উঠে। সেই কোমল কর্দ্দমাস্তীর্ণ পল্লীপথে পা টিপিয়া চলিতে যে কি আরাম তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের বুঝিবার সাধ্য কি ? তাহার উপর মাঝে মাঝে যাহাকে

সচরাচর 'কেরাণী ভিজানো' বৃষ্টি বলা হইয়া থাকে এবং যাহাকে ছাত্র ও শিক্ষক ভিজানো বারিধারা বলিলেও কোনই অত্যুক্তি হয় না—সেই বৃষ্টি দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায় কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্যে পথে পা বাড়াইবা মাত্র এই বৃষ্টিবর আবির্ভূত হ'ন এবং আপিসে বা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবা মাত্রই তিনি রসিকতা শেষ করিয়া সরিয়া পড়েন। পল্লীর এই হতভাগ্য বালকটির সহিত তামাসা করিতেও সেই স্বর্গবারি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না। ফলে সৃষ্টিধর ভিজিয়া নাহিয়া উঠে এবং সেই সিক্ত কাপড় তাহার অঙ্গেই বিশুষ্ক হইয়া যায়! তবে হাঁ—শীতকালে বরং পথ চলিবার পরিশ্রমে তাহার শরীর গরম হইয়া উঠে। ভালই হয়। শীত নিবারণের পক্ষে উহা বিশেষ কার্য্যকরী তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে কি?

ভগবান যাহাকে সহিতে দেন তাহাকে সহিবার উপযুক্ত শক্তি বোধ হয় দিয়া থাকেন নতুবা বৎসরের পর বৎসর অশেষ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সৃষ্টিধর সহ্য করিল কি করিয়া? অসুখ-বিসুখে 'মাদুরগত' হইয়া পড়িয়া থাকিতেও তো তাহাকে কখন দেখিয়াছে বলিয়া কাহারও মনে পড়ে না। "শরীরের নাম মহাশয় যাহা

সহা'ও তাহাই সয়।" এবং "যে সয় সেই রয়।"—বাক্য দুইটি যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, তাহার জীবন্ত উদাহরণ প্রদান করিবার জন্যই বোধ হয় সৃষ্টিধরের সৃষ্টি!

এইরূপ দুঃখে কষ্টে, দিনের পর দিন কাটিয়া মাস, মাসের পর মাস কাটিয়া বৎসর, এবং বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সৃষ্টিধর যোগত্যার সহিতই উত্তীর্ণ হইল। এখনও 'স্কলারশিপের লিষ্ট' বাহির হয় নাই বটে, তথাপি ষ্টার সহ পাঁচটি বিষয়ে সে লেটারও পাইয়াছে। তাহার বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়গণও আশা করিতেছেন,—সে কিম্পটই করিবে, এখন ভগবান ভরসা!

পরিশ্রম করিলে সত্যই পুরস্কার পাওয়া যায়। যাহারা কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করে না, ভগবান সত্য সত্যই তাহাদিগকে সাহায্য করেন। তাহাদিগের সকল চেষ্টা সফলতার মাল্যে বিভূষিত করিয়া তাহাদিগের জীবন তিনি ধন্য করিয়া তুলেন। সৃষ্টিধরও তাহাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। জীবনের গতিবেগে সেইহেতু সে কিছুতেই ছন্দপাত হইতে দিতে চাহে না। সে চলিবে, সে চলিবে, কিছুতেই থামিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিধরের মাতাকে তাঁহার দেবর মহাশয় বলিলেন, "পরীক্ষায় পাশ তো 'ছেষ্টা' ভাল ক'রেই ক'রেছে, আর কেন বৌদি ? যথেষ্ট হয়েছে। এইবারে ছেলের 'বিয়ে থাওয়া' দিয়ে তা'কে সংসারী কর। খুব একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে—ঠিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে এসে আপনি ধরা দিয়েছে।"

সৃষ্টিধরের মাতা কিন্তু আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াও খুশী হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"ছেলে আমার নেহাৎ বাচ্চা, এখনই ওর বিয়ে কি ঠাকুরপো, আর বিয়ে ক'রে নিয়ে এসে ও তা'কে খাওয়াবেই বা কি ? তা' ছাড়া ও যে আরও পড়তে চায়, এখনই পড়া শেষ করা ওর ইচ্ছে নয়। ওর সেই সাধ যা'তে পূর্ণ হয়, সেই ব্যবস্থা একটু ক'রে দাও ভাই,—তোমরা সকলে।"

"সেই ব্যবস্থার জন্যই তো বল্‌ছি বৌঠান, হাজার

হ'লেও আমি ওর আপনার কাকা! আমি ব্যবস্থা না ক'রলে, আর কে ক'রবে বলতো? সকলে তো কেবল দূষ্‌তেই পারে, কিন্তু আমি যা' ক'রেছি, করুক তো দেখি আর কেউ! তোমরা শুদ্ধ আমাকে শত্রু মনে কর। কর না? সত্যি ক'রে বল দেখি—কর কি না।"

বৌদিদি জিভ্‌ কাটিয়া বলিলেন,—"সে কি কথা ঠাকুরপো! তোমরা ছাড়া ছেলের আপনার ব'লতে আর কে আছে? তোমরা ওর মঙ্গল চাইবে না তো কে চাইবে?"

উপরের কথাগুলি বৌঠান যন্ত্রচালিতবৎ বলিলেন বটে কিন্তু ঠাকুরপোর বিগত দিনের আচরণসমূহের সহিত আজিকার কথার সামঞ্জস্য সাধন করিতে না পারিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—এতদিন পরে এ সকল কথার অর্থ কি?

এদিকে বৌঠানের কথায় ঠাকুরপো যেন বেজায় খুশী হইয়া উঠিলেন। তিনি সাধ্যমত তাঁহার মুখখানায় একটা হাসির প্রলেপ মাখাইয়া বলিলেন,—"তাই বল বৌঠান, তাই বল, সৃষ্টিধর আমার বংশেরই সৃষ্টিধর তো! ওর গৌরবে আমার বংশেরই মুখ উজ্জ্বল হ'বে, না আর

কা'রও হ'বে ? তাই বল তো ! সব কথাটা আগাগোড়া তবে তোমাকে ভেঙেই বলি—শোন ! জমীদারবাবু সেদিন আমার হাতখানা চেপে ধ'রে অনুনয় ক'রেই ব'ল্‌লেন,—"হলধর, তোমার ভাইপোর সাথেই আমার তরুর বিয়ে দিতে চাই, আশা করি এতে তোমার কোন অমত হ'বে না। ছেলের পড়াশুনার যাবতীয় ব্যয় আমিই বহন ক'রব। সে যতদূর প'ড়তে চায় পড়ুক। পরে তা'কে বিলেত পর্য্যন্ত পাঠাব—তা'তে যত টাকা লাগে লাগুক ! ছেলেটা আমাকে দাও। আর তোমার—হাঁ, তারপর একটু থেমে ব'ল্‌লেন,—আশা করি তোমার এতে অমত হ'বে না ! বটেই তো ! এতে আবার কি অমত থাক্‌তে পারে ? এতো অতি সুপ্রস্তাব। আমার ওপর তাঁ'র ভালবাসার সীমা নেই ব'লেই না তিনি এ প্রস্তাব ক'রেছেন, নইলে কি আর এই অসম্ভব প্রস্তাব তিনি ক'রতেন ? আমিও তেমনি হাসিমুখে এক কথায় স্বীকার হ'য়ে এলুম। কি বল বৌঠান, এমন সম্বন্ধ কি মানুষে কখনও ছাড়তে পারে, না ছাড়ে ? তুমিই বল না বৌঠান ?"

বৌঠান কিন্তু কিছুই বলিলেন না, চুপ করিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃজায়াকে চিন্তা

করিতে দেখিয়া হলধরবাবু যেন একটু বিরক্তই হইলেন। তিনি এইবার সামান্য একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলিলেন,—"এত কি ভাব্‌ছো বৌঠান? আমাদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে এমন সম্বন্ধ জুটেছে। সৌভাগ্য কদাচ কখনই দেখা দেয়—রাতদিন যখন তখনই দেয় না। যে চালাক সে সুযোগ কখনও অবহেলায় হারায় না। তোমরাও যদি হারাও তবে জান্‌বো—তোমাদের কপালে অনেক দুঃখই আছে। তোমার ছেলে এমন কি হয়েছে বল তো; একটা পাস দিয়েছে,—এই তো? কেষ্টও হয় নি কি বিষ্টুও হয় নি। অত সামান্যেই ধরাকে অমন সরা জ্ঞান ক'রো না!"

"আমি তা' করি না ঠাকুরপো, তবে ছেলে উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে করে, এ আমি চাই নি, ছেলের মত যতদূর জানি, সেও তা' চায় না। তাই বল্‌ছি আরও কিছুদিন যা'ক্!"

"হুঁ! আরও কিছুদিন যাক্! ততদিন জমিদারবাবু তোমার ছেলের পথ চেয়ে হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌বেন নাকি? আব্দার দেখ না!"

"না, তা' কেন তিনি থাক্‌তে যাবেন ঠাকুরপো! তাঁ'র অভাব কি? আমার ছেলের চেয়ে সহস্রগুণ

ভাল ছেলে তিনি ইচ্ছে ক'রলেই যে কোন মুহূর্তেই পাবেন।"

"তা' তো পাবেনই, নিশ্চয়ই পাবেন, একশোবার পাবেন, কিন্তু আমি গিয়ে এ কথা তাঁ'কে বলি কোন মুখে—তিনি রাগ ক'রবেন না ?"

"তিনি মহানুভব লোক! বুঝিয়ে ব'ল্‌লে তিনি কখনই রাগ ক'রবেন না।"

"নিজের ভাল পাগলেও বোঝে, তোমরা তা'ও বোঝ না। আশ্চর্য্য! আচ্ছা, আমি তাড়া দিতে চাই নি। দুই একদিন বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখে তারপরই উত্তর দিও। আমি না হয় দু' চারদিন পরে গিয়েই বাবুকে একেবারে পাকা কথাই দিয়ে আস্‌বো। মোদ্দা ভাল ক'রে ভেবে দেখো—ছেলের আখেরটা নষ্ট ক'রো না। একবার ভাব দেখি ছেলে কত বড় সহায় পাবে, জীবনে কি তা'র আর কোন কষ্ট থাক্‌বে ? থাক্‌বে না। এর পর পায়ের ওপর পা তুলে দিনগুলো দিব্বি সুখে ফুঁকে দিতে পারবে।"

"তা' হয়তো পারতে পারে কিন্তু দিনগুলো কোনরূপে কেটে গেলেই কি জীবন সার্থক হয় ঠাকুরপো ? আর সহায়ের কথা ব'লছো ?—"

"না কিছু ব'লছি না। পণ্ডিত পুত্রের সাথে সাথে তুমিও যে একজন মস্ত পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছ তা' জানি, কিন্তু আমরা মূর্খ মানুষ অত পণ্ডিতি আমাদের ধাতে সহ্য হয় না, ভালও লাগে না। পণ্ডিত বেটার সঙ্গে যুক্তি ক'রে হাঁ, না, যা' হয় একটা কিছু দয়া ক'রে ব'লো, আমি তাই গিয়ে বাবুকে জানাব! আমার হয়েছে যত ইয়ে—"

"ঠাকুরপো, রাগ ক'রলে? আমি তো কোন—"

"না রাগ ক'রবে না! যত সব ইয়ে—" ঠাকুরপো রাগ সামলাইতে না পারিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

বৌঠান বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"এ আবার কি বিপত্তি!"

এমন সময় সৃষ্টিধর তথায় আসিয়া মায়ের কোল ঘেঁসিয়া বসিল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে কোন কথা আছে?" পুত্র বলিল,—"আছে বৈ কি মা, একটা কথা কেন, দশটা কথা আছে, আর তাই ব'ল্তেই তো এসেছি মা!"

"তা' তো এসেছিস্। এদিকে আমারও যে অনেক কথা তোকে বলবার জন্যে জমা হ'য়ে রয়েছে বাবা!"

দশটি করিয়া মুদ্রা যে প্রতিমাসে পাঠানো হইতেছে, ইহার জন্যেও কি খুড়া মহাশয় ও খুড়ীমা এতটুকু হন নাই? সেজন্যও কি মায়ের প্রতি তাঁহারা একটু সুব্যবহার করিবেন না? মাতার খরচের নাম করিয়াই সে টাকা পাঠায় সত্য কিন্তু মাতা যে তাহা খরচ করিতে পান না, তাহা সে ভালই জানে। তবুও পাঠায়! পাঠায় অবশ্য খুড়াকে,—বিশেষ করিয়া খুড়ীকে খুশী করিবার জন্যই। ইহাতে খুশী হইয়া যদি মাতাকে আর কোনরূপ ক্লেশ না দেন—এই জন্য।

সৃষ্টিধর ভাবে,—এখন হয়ত খুড়ীমা আর মায়ের প্রতি নিশ্চয়ই তেমন দুর্ব্যবহার করেন না। শুধু শুধু একজন নিরীহ গো-বেচারীর প্রতি মানুষ চিরকাল কি করিয়া অনর্থক খারাপ আচরণ করিতে পারে? তাঁ'কে যত খারাপ বলিয়া মনে করা হয় তিনি হয়ত তত খারাপ নাও হইতে পারেন। আজ তাঁহার জন্যও সৃষ্টিধরের মন যেন কেমন করে! তাঁহার প্রতি বিরাগের মাত্রাও যেন অনেকখানি হ্রাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া সৃষ্টিধরের মনে হয়।

কিন্তু এমনও তো হইতে পারে—আজ একাকী পাইয়া মাতার প্রতি খুড়ীমাতার নির্য্যাতনের মাত্রা

বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মা কিন্তু কোন চিঠিতে একটু-খানিও অনুযোগ করেন না। নিশ্চয়ই আমি কষ্ট পাইব, আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই তিনি তাহা করেন না। মাকে তো আমি জানি। এমন মা এ জগতে কয়জনার হয়? এই মাকে কি আমি কোনও দিন একটুও সুখী করিতে পারিব না? ভগবান, বল দাও প্রভু,—হৃদয়ে বল দাও! মাকে শান্তিতে রাখ! খুড়া ও খুড়ীমার মন মায়ের প্রতি ভাল করিয়া দাও। তাঁহারা যেন তাঁহাকে আর না কোনরূপ নির্য্যাতন করেন। মা আমার দিন রাত মুখ বুজিয়া ভূতের খাটুনি খাটেন, তাহার পরও যদি—এতটুকু মিষ্টি কথা দূরে থাকুক—কেবল কটু কথা শোনেন তাহা হইলে বাঁচিবেন কি করিয়া? একজন যদি অপরকে কষ্ট দিব বলিয়াই ধর্ম্মভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়া থাকেন তবে অপরে সহস্র চেষ্টাতেও যে তাহার হাত হইতে রেহাই পায় না প্রভু! ভগবান, দয়া কর! তোমার কৃপায় অসম্ভবও যে সম্ভব হয় প্রভু!

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম।
যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

তাঁহার কৃপায় সত্যসত্যই অসম্ভবও অনেকখানি সম্ভব হইয়াছিল। সৃষ্টিধর সে কথা জানিত না।

ঠাকুরপো তাঁহার বৌঠানের প্রতি আর বিশেষ তর্জ্জন গর্জ্জন করেন না। জায়ের ব্যবহার একেবারে মোলায়েম না হইলেও আগেকার মত তাহাতে তত উগ্রতা যেন আর নাই। কিন্তু কেন? সৃষ্টিধরের মাতা ইহার কোন কারণই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। পুত্র টাকা পাঠায়—তাহাই কি? সেটা কিঞ্চিৎ গৌণ কারণ হইলেও মুখ্য কারণটা কিন্তু তাহা নহে।

মুখ্য কারণ জমিদার বাবু আরও দুই বৎসর অর্থাৎ শ্রীমানের আই-এ, পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন বলিয়াছেন এবং হলধর বাবুকে বর্ত্ত-মানেও জমি-জমা সংক্রান্ত কি কি বিষয়ে জানি না অনেকখানি নাকি সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন এবং ভবি-ষ্যতে জমিদারের বেহাই হইলে যে তাঁহার 'একাদশ বৃহস্পতি' হইবে—সে বিষয়েরও অনেকখানি আভাস প্রদান করিয়াছেন। সেই জন্যেই এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

সৃষ্টিধরের দুঃখের দিন কি তবে ফুরাইয়া আসিল? প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে সে ইহার বহু গুণ দুঃখ সহ্য করিয়াছে! মাতার অদর্শন কষ্ট ভিন্ন এখন তো তাহার অপর কোন দুঃখ নাই বলিলেই চলে। কলেজের সুদীর্ঘ

ছুটির ভিতর যাইয়াও তো সে মাতাকে মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতে পারে! তবে আর তাহার দুঃখ কি?

নিজের পড়িবার খরচের অবশিষ্ট টাকার উপর অতি মিতব্যয়িতারূপ বাণিজ্য করিয়াও সৃষ্টিধর কিছু কিছু প্রতি মাসে তাহা হইতে সঞ্চয় করে, নতুবা পরীক্ষার ফি আসিবে কোথা হইতে? নিজের নামে 'সেভিং ব্যাঙ্কসে' সে একটা 'একাউণ্ট' খুলিয়াছে। সে মাসে মাসে যৎসামান্য যাহা কিছু বাঁচাইতে পারে, আমোদে প্রমোদে অপব্যয় না করিয়া তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখে। এই মিতব্যয়িতার জন্য দীর্ঘ অবকাশের সময় যখনই সে গৃহে গমন করে তখনই গৃহের সকলেরই জন্যে সাধ্যমত কিছু না কিছু প্রতিবারেই সে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

দিন চলিয়া যায়—সুখেই চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে যে ঝড় ঝাপ্‌টা একেবারেই আসে না তাহা নহে তবে সে তাহাকে গ্রাহ্য করে না—আমলই দিতে চাহে না। লেখাপড়া সম্বন্ধে মাতার অভিমত সৃষ্টিধরের মনে পড়ে, —'সে কালের মুনি ঋষিরা যেমন কাম্যফল লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিতেন, বিদ্যার্জ্জনের নিমিত্তও বালকদিগের সেইরূপ কঠোর তপস্যার প্রয়োজন, তবেই তাহারা কাম্যফল লাভ করিতে পারে, নতুবা পারে না।'

সৃষ্টিধরও সেই তপস্যাই করে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে তাহার লেখা-পড়া করিতে থাকে।

পরিশ্রম করিলেই পুরস্কার করতলগত হইয়া থাকে, সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টিধর এবারেও তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিল! এমন করিল যে দেখিয়া শুনিয়া সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। যথাসময়ে আই-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল, সে-ই উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং বি-এ পড়িতেও তাহার কোনই কষ্ট হইবার কথা তো নহে। যেরূপ ভাবে সে আই-এ পাস করিয়াছে, সেইরূপ করিয়া সে বি-এও পাস করিতে পারে। যে কলেজে পড়িয়া সে আই-এ পাস করিয়াছে, সেই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইবার নানা প্রকারে আরও অধিক সুবিধা তাহাকে প্রদান করিলেন। ইহার উপর জলপানির টাকাও তো রহিয়াছে। তবে আর ভাবনা কি? এদিক দিয়া ভাবনার কারণ না থাকিলেও অপরদিক দিয়া ভাবনার কারণ তাহার যথেষ্টই আসিয়া জুটিল।

জমিদারবাবু সৃষ্টিধরের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের

জন্য এইবার আবার হলধর বাবুকে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন কিন্তু সৃষ্টিধরের মাতার কিছুতেই স্বীকার পান না। পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হইলে তিনি কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিবেন না। আর যখন দিবেন তখনও কোথায় দিবেন তাহাও আগে থাকিতেই তিনি কথা দিতে পারেন না।

হলধরবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর উপযু্যক্ত অভি-মত শ্রবণ করিয়া একেবারে 'তেলে বেগুনে' জ্বলিয়া উঠিলেন।

"কলিকাল আর ব'লেছে কা'কে! ছোটবাবু যদি 'ছেষ্টাকে পাঠশালে ভর্ত্তি ক'রে না দিতেন তা' হ'লে আজ ছেলে দিগ্‌গজ হ'ত কি ক'রে? সেটা একবার ভেবে দেখো না!"

"সে জন্য আমরা তাঁ'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ ঠাকুরপো! কিন্তু এ তো অন্য সরিকের কথা! আর সরিকে সরিকে তাঁ'দের যে কতদূর মিল, তা'তো সকলেই জানে! সুতরাং ছোটবাবুর তো অসন্তুষ্ট হ'বার কথা নয় ভাই, তিনি কি তাঁর' ও বাড়ীর বোনের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন ব'লে ওকে পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন? যে জন্যে পাঠিয়েছিলেন—সেই অভিনয় তো ছেলে আমার অনেকবার ক'রেছে!"

ঠাকুরপো দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন,—"তা'তেই কি ছেলের ঋণ সম্পুর্ণ শোধ হ'য়ে গেল ?"

"এ সব ঋণ কি শোধ দেবার ভাই, যে ও শোধ দেবে ? আর এ ঋণ শোধ দিলে যে দাতাকে অপমানিতই করা হয় ঠাকুরপো ! ও যদি কখনও দিন পায় তবে জমিদার বাড়ীর সেবা ক'রে, ঋণ শোধ না দিয়ে ঋণের মাত্রা আরও বাড়িয়েই তুলবে। তুমি সে জন্য ভেবনা ঠাকুরপো !"

ঠাকুরপো এইবার ক্রোধে চতুর্ভুজ হইয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই অপরূপ দৃশ্য চোখে না দেখিলে কেবলমাত্র লেখা পড়িয়া সত্যই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। তিনি যাহা মুখে আসিতে লাগিল তাঁহাই বলিতে লাগিলেন। গুরু লঘু কিছুই আর বাদ দিলেন না। তাহার ডালপালা ছাঁটিয়া, কুশ্রী বিশ্রী কথা বাদ দিয়া যেটুকু না বলিলে নেহাৎ নয় তাহাই মাত্র এখানে বলা হইতেছে,—"পণ্ডিত পুত্রের পণ্ডিত মা, কি যে বলেন তা'র মাথামুণ্ডু কিছুই খুঁজে মেলে না। আমাদের মত মুখ্যু সুখ্যু মানুষের ও হেঁয়ালির অর্থ বোঝা ভার। আর বুঝ্‌তেও চাই না। ঢের হয়েছে, ঢের সয়েছি ! আর নয়। এইবার নিজের পথ দেখ। অত বড় জেদী, পাজী

ঠাকুরপো এইবার ক্রোধে চতুর্ভুজ······চিরকাল কখনো স'ন্ না, স'ন্ না, স'ন্ না। [পৃঃ—৬৪]

লোককে আমি ঘরে ঠাঁই দেই না। ছেলেকে লেখো সে এসে তা'র পণ্ডিত মাকে নিয়ে দূর হো'ক্। আপদ বিদায় হোক্—নিকাল যা'ক্।"

হলধর-গৃহিণীও এই সময় আসিয়া স্বামীর সহিত ঐক্যতানবাদন জুড়িয়া দিলেন,—"দূর হ', দূর হ'। চুলোয় যা! আবার ছেলের আসার 'অপিক্ষে' কেন? কি বজ্জাত মানুষ রে বাবা, একদিন একটা কথা রাখ্‌লে না! দূর হ! দূর হ! চুলোয় যা'! আমি গোবর জলের ছড়া দি। আগে সাত চড়ে মুখ দিয়ে 'রা' বা'র হ'ত না, এখন লম্বা লম্বা বোল ফুটেছে। পণ্ডিতের মা হ'য়ে চোখে আর কিছু দেখতে পান্ না যেন। থাক্‌বে না, থাক্‌বে না, ও দেমাক চিরকাল থাক্‌বে না। দর্পহারী কংসারি আছেন। দর্পীর বাড় বাড়ন্ত ভগবান চিরকাল কখনো স'ন্ না, স'ন্ না, স'ন্ না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পথে একটি উন্মাদ-রোগগ্রস্তা নারীকে দেখিয়া Wordsworthএর রচিত The Affliction of Margaret শীর্ষক কবিতাটি সহসা সৃষ্টিধরের মনে পড়িয়া গেল। এই উন্মত্তা নারীও কি তাহার পুত্রের জন্যই পাগলিনী হইয়াছেন ? কে জানে ?

সৃষ্টিধরের তখন আপন মাতার কথা মনে পড়ায় তাঁহার জন্য মন কেমন্ করিতে লাগিল। 'তিনি তো কুশলে আছেন ? না জানি তিনি আমার অদর্শনে ও খুড়ীমার নির্য্যাতনে কি কষ্টই না পাইতেছেন !'—সৃষ্টিধর ভাবিতে ভাবিতে মেসে আসিয়া ঢুকিল। পুস্তকাদি যথা স্থানে রাখিয়া যন্ত্রচালিতবৎ সে হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া আপন শয্যায় উপবেশন করিল। বসিয়া বসিয়া সে মাতার কথাই ভাবিতে লাগিল।

তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী সহপাঠী আলোক কয়েক-

দিন হইল কি কারণে বাড়ী গিয়াছে। সে একটু কষ্ট করিয়া সৃষ্টিধরের মাতার সংবাদ আনিয়া দিবে বলিয়াছে। আজ তাহার ফিরিবার কথা। আসিয়াই সে দেখা করিবে বলিয়া গিয়াছিল। ফিরিলে সে এতক্ষণে দেখা করিতে আসিত। তবে কি সে আজ ফিরিতে পারে নাই?

একে একে মেসের অধিকাংশ বালকই জলযোগাদি সারিয়া বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গেল। মেসের কল-কোলাহল যতই প্রশমিত হইতে লাগিল ততই সৃষ্টিধর আপনার চিন্তাসাগরে ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর নিমজ্জিত হইতে লাগিল। কখন যে আলোক আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে, সে তাহার এত-টুকুও টের পায় নাই। তাহার চিন্তা-সমাধি কিছুতেই ভগ্ন হইল না দেখিয়া আলোকই তাহা ভগ্ন করিয়া বলিল,—"কি রে এত কি ভাব্‌ছিস্ বল্‌তো? সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছি, তা' একটু টেরও পাস্ নি?"

"কে আলোক? কখন এলি ভাই? সত্যি আমি একটুও টের পাই নি। বোস্, বোস্।"

অতঃপর সৃষ্টিধরের পার্শ্বে আলোক আসন গ্রহণ করিলে সৃষ্টিধর পুনরায় বলিল,—"তোর আস্‌তে দেরি দেখে ভাব্‌লুম,—তুই বুঝি আজ ফিরতে পারিস্ নি। তা' খবর কি? আমাদের গাঁয়ে যেতে পেরেছিলি?"

সেদিন কলেজ হইতে......কে জানে ? [পৃঃ—৬৭]

"খবর আর কি ব'ল্‌বো ভাই, খবর বিশেষ ভাল নয়।"

"অ্যাঁ! মায়ের কি কোন অসুখ ক'রেছে?"

"না, না, শারীরিক তিনি যে বিশেষ কিছু পীড়িত হ'য়েছেন তা' নয়। তবে মানসিক অশান্তির তাঁর আর শেষ নেই। তাঁ'র আর ওখানে থাকা চ'ল্‌বে না ভাই, দিনরাত এত নির্য্যাতন কি মানুষে সইতে পারে? সব কথা শুনে' শুধু শুধু কষ্ট পেয়ে কোন লাভ নেই। তা'র চেয়ে তাঁ'কে অপর কোনও জায়গায় রাখ্‌বার ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভেবে দেখ। ওখানে থাক্‌লে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না।"

সৃষ্টিধর মস্তবড় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"দুনিয়ায় আমার কেউ কোথায়ও আপনজন নেই যে তাঁ'র কাছে মাকে দু'দিন রেখে নিশ্চিন্ত হ'ব। আমাদের সাতপুরুষের ওই ভিটেটুকুর ওপর মায়ের প্রাণের টান যে কত গভীর তা' তো আমি জানি ভাই,—তিনি তো কোন কথাই আমাকে জানান নি।"

"আমাকেই কি তিনি কিছু বলেছেন! বলেন নি। গ্রামের দশজনের কাছেই আমি সব শুনেছি। তাঁ'র শরীরটাও এবারে বিশেষ ভাল ব'লে বোধ হ'ল না। তবে' অবশ্য ভয় পা'বার মত কিছু নয়।"

সৃষ্টিধর কিন্তু ভয় পাইয়া গেল। সে বলিল,—"তা' হ'লে এখন আমি কি ক'রবো ভাই? সামান্য জলপানির ওই ক'টি টাকা আমার সম্বল, অথচ তাঁ'কে আন্‌তেই হ'বে। আচ্ছা ভাই, আমার একটা টুইশানি জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্?"

আলোক উত্তরে বলিল,—"সে চেষ্টা চরিত্র ক'রলে কি একটা জোটানো যা'বে না? তা' হয়তো যা'বে কিন্তু তোর পড়াশুনার যে বড় ক্ষতি হ'বে!"

"তা' হো'ক! মা আগে, না লেখাপড়া আগে? মা-ই যদি না বাঁচ্‌লেন তো পড়াশুনা দিয়ে আমার কি হ'বে? সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে আমার কয়েকটি টাকা জমা আছে, তাই তুলে নিয়ে, আমি কালই দেশে মাকে আন্‌তে যা'ব। তা'র আগে মাথা গুঁজবার একটা স্থান দেখ্‌তে হ'বে তো! নইলে তাঁ'কে নিয়ে এসে উঠ্‌বো কোথায়? আচ্ছা দশটাকার ভেতর সুবিধামত একটা জায়গা মিল্‌বে না ভাই? কলকাতায় বাড়ী ভাড়া যা অসম্ভব শুন্‌তে পাই, তা'তে ভরসা হয় না।"

আলোক উত্তর দিল,—"চেষ্টা ক'রলে একটা মিলবে বৈ কি! কলকাতায় সবই মেলে ভাই! এখানে ভাল ও দামীরও যেমন অন্ত নেই, খেলো এবং সস্তারও তেম্‌নি

আনন্দ বাজার

শেষ নেই। তবে চেষ্টা ক'রে সুবিধামত একটা খুঁজে নিতে হয়।"

"সে চেষ্টা ক'রবার মত সময় যে নেই ভাই!"

"ও যা' আছে ওতেই হ'বে। আজকার এ বেলাটা ও কালকের সকাল বেলাটাও তো পা'ব। এর মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তো তুই মাকে নিয়ে আমাদের ওখানেই উঠিস্, পরে দেখে শুনে' একটা বাসা নিলেই চ'লবে।"

"সে পরের কথা পরে হ'বে ভাই, আগে যে সময়টুকু হাতে আছে সে সময়টুকুতে একটু চেষ্টা ক'রে দেখি। তারপর তোর ওপর তো কত অত্যাচারই ক'রছি, আরও খানিকটা ঋণ না হয় বাড়াব।"

এবারে আলোক কিন্তু রুখিয়া উঠিল,—"ফের যদি তুই ঋণ-টিন অত্যাচার-টত্যাচারের কথা তুলবি তবে যা' তুই নিজেই চেষ্টা করগে যা'—আমি বিদেয় হই!"

"সত্যিই তো তোর ঋণ কি শোধ দেবার রে? এই নির্ম্মম জগতে আমার মত হতভাগার মুখের দিকে তো কেউই তাকায় না। অথচ তুই—"

আলোক বলিল,—"ফের যদি ও সব ব'লবি তবে এই আমি চ'ললুম।"

"না, না, রাগ করিস্ নি ভাই, চল আর দেরি না ক'রে, বা'র হ'য়ে পড়ি—যদি আজই একটা কিছু মেলে।"

আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া তখন দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি বাহির হইল। রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে আবার সৃষ্টিধরকে মেসে ফিরিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বষ্টিধর বাসা ভাড়া করিয়া অবশেষে বাড়ী হইতে মাতাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছে। মাতা যে এত সহজে বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে স্বীকৃত হইবেন, সৃষ্টিধর পূর্ব্বে তাহা মনে করিতে পারেন নাই, কেননা ওই ভিটেখানির উপর মাতার যে কি প্রাণের টান, তাহা স্বষ্টিধর তো ভাল করিয়াই জানে। তবু তিনি আসিতে বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলেন না। সুতরাং খুড়ীমাতার বাক্য যন্ত্রণার মাত্রা যে কত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহা সহজেই স্বষ্টিধর কল্পনা করিয়া লইল। আর কল্পনা করিবারই বা প্রয়োজন কি? সে কি নিজেই কিছু জানে না,—না দেখে নাই? এবারেও মাতাকে আনিতে যাইয়া খুড়ামহাশয় ও খুড়ীমার কি আচরণই না এই সামান্য সময়ের মধ্যেই সে দেখিয়া আসিয়াছে। দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া না দিয়া, মিষ্ট মুখে বিদায় দিলে কি বিশুদ্ধ

মহাভারত একেবারে অশুদ্ধই হইয়া যাইত। খুড়ামহাশয় ও খুড়ীমাতা, তাহাদিগকে কেবল হাতে ধরিয়া মারিতে বাকী রাখিয়াছেন! তাহার উপর যাহা ইচ্ছা হয় করুন কিন্তু মাতার নির্য্যাতন যে অসহ্যই হইয়া উঠে। আর মাতা তো সম্পর্কেও তাঁহাদিগের অপেক্ষা বড়। সেই সম্পর্কের সম্মানও কি একটু দিতে নাই। সৃষ্টিধর ভাবিতে লাগিল,—তা' না দিলেন, নাই দিলেন, এখন তো তাঁহাদিগের হস্ত হইতে মাতা উদ্ধার পাইয়াছেন অতএব আর ওসব অপ্রিয় কথা ভাবিয়া মনকে ক্লিষ্ট করিয়া লাভ কি? মাতাকে যাহাতে সম্পূর্ণ সবল ও সুস্থ করিয়া তুলিতে পারা যায় এখন কেবল তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার সম্বল কোথায়? সামান্য জল-পানি ও কলেজের 'ষ্টাইপেণ্ডে'র কয়েকটি টাকায় সে কি করিয়া চালাইবে? বাসার ভাড়াটা তাহার পক্ষে একটু অধিকই হইয়াছে। গলির ভিতর একতলা বাড়ীর দেড়-খানি ঘর ও একটা বারান্দা, কল পায়খানা সমেত সে পনের টাকায় ভাড়া লইয়াছে। তবে কলিকাতার পক্ষে যাহা নিতান্ত অসুলভ সেই রৌদ্র ও বাতাস একটুখানি পাওয়া যায়। এই বাসাই খুঁজিয়া বাহির করিতে, আলোক ও সৃষ্টি ওই অল্প সময়ের মধ্যে যে কি করিয়াছে

আর কি না করিয়াছে তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। সমস্ত সহরটা যেন তাহারা চষিয়া ফেলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতায় অল্প ভাড়ায় মনোমত বাসা খুঁজিয়া পাওয়া যে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্র আর কে বুঝিবে?

যা'ক বাসাতো হইয়াছে—ভালই হইয়াছে; কিন্তু বাসায় তো কূপ নাই! মাতা কলের জল পান করিবেন না। গঙ্গাজল চাই। তাহাতেও কিছু খরচ পড়িবে। জলের জন্য "ভারী" বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সৃষ্টিধর অবশ্য মেস ছাড়িয়া দিয়াছে। মেসের জন্য তাহার যে টাকাটা খরচ হইত এখন তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে, কিন্তু অনেকগুলি টাকার পাঠ্যপুস্তক এখনও তাহাকে কিনিতে হইবে। মাতাকে ভাল ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থের প্রয়োজন!

সৃষ্টিধর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও ব্যয়ের উপযুক্ত আয়ের জের টানিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে কোন কুলকিনারা না পাইয়া, টুইশানি করিবে বলিয়াই সে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া সংবাদপত্রের 'কর্ম্মখালি'র স্তম্ভে মনোমত টুইশানি খুঁজিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন তিন চারি-খানি করিয়া কাগজ ক্রয় করিতে ট্যাঁকের পয়সা জলের

মত ব্যয় হইতে লাগিল বটে কিন্তু টুইশানি মিলিল না, কেবল হাঁটিয়া হাঁটিয়া জুতার গোড়ালি ক্ষয় হইতে লাগিল মাত্র। অবশেষে সে একটা কাগজের ফেরিওয়ালার সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিল যে ফেরিওয়ালা তাহার সকল কাগজগুলির বিজ্ঞাপনের স্তম্ভসকল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য সৃষ্টিধরকে পড়িতে দিবে তাহার বিনিময়ে ফেরিওয়ালা সৃষ্টিধরের নিকট হইতে এক আনা দক্ষিণা পাইবে!

সৃষ্টিধরের এখন হইতে কাজ হইল যে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মোড়ের মাথায় ফেরিওয়ালার নিকট যাইয়া কাগজ হইতে টুইশানির কোন বিজ্ঞাপন পাইলে সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞা-পনদাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কার্য্যটি পাইবার জন্য আবেদন করা। কিন্তু চেষ্টা তাহার সফল হয় না, কেন না সে তো গ্রাজুয়েট নহে। গ্রাজুয়েট, পোষ্ট গ্রাজুয়েটের চাপে সে পিষিয়া যাইতে লাগিল।

সংসারের প্রকৃত মূর্ত্তি এতদিনও সে ভাল করিয়া বোধহয় চিনিতে পারে নাই। এইবারে যেন একটু একটু করিয়া চিনিতে আরম্ভ করিল। সংসার সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মুখে মানুষ হায় কত শক্তিহীন! কত অসহায়!

সৃষ্টিধর তথাপি হাইল ছাড়িয়া মাথায় হাত দিয়া

বসিয়া পড়িল না। কয়েকদিন মাত্র নিরুৎসাহ,—তাহার বিমর্ষ বদনে ম্লানিমার যবনিকা টানিয়া দিলেও শীঘ্রই সেই কৃষ্ণ যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে দেখা যাইল। যতই সে বাধা পাইতে লাগিল ততই কি তাহার উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল?

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে—"God helps those who help themselves." বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য! নতুবা সৃষ্টিধরের যে সৌভাগ্য-সূর্য্য এতদিন ঘনমেঘে অবলুপ্ত হইয়া সুপ্তিতে দিন কাটাইতেছিল, তাহা সহসা এমন করিয়া দশদিক উজ্জ্বল করিয়া জাগিয়া উঠিবে কেন?

সৃষ্টিধরের সৌভাগ্যের কারণটা এইবারে একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। একদিন সকালে উঠিয়া কয়েকখানা কাগজে সে বিজ্ঞাপন দেখিল যে একজন পাঠপ্রিয় অসুস্থ ভদ্রলোকের, পুস্তকাদি পড়িয়া শুনাইবার জন্য একজন পাঠকের প্রয়োজন। ভদ্রলোকটির পড়াশুনাই জীবনের একমাত্র আসক্তি কিন্তু অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকগণ তাঁহাকে স্বয়ং পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তবে এক আধ ঘণ্টা অন্যে পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি শুনিতে পারেন। তাই এই বিজ্ঞাপন! নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত দক্ষিণাই দেওয়া হইবে।

সৃষ্টিধর বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া, ঠিকানাটি আপন 'নোট-বুকে' টুকিয়া লইয়াই ঠিকানা অভিমুখে একরকম ছুটিয়াই চলিল। সে ভাবিয়াছিল,—অত প্রত্যূষে নিশ্চয়ই তাহার অগ্রে কেহই তথায় যায় নাই। অতএব সকলের আগে যাইয়া প্রথমে দেখা করিতে পারিলে হয়ত কাজটি তাহার মিলিতেও পারে। কিন্তু গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সে ভ্রম চূর্ণ হইয়া গেল। সৃষ্টিধর দেখিল, তাহার পূর্ব্বেই আট দশজন কর্ম্মপ্রার্থী তথায় বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছে। সেও যাইয়া প্রকাণ্ড ফরাসের এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিল। ক্রমে ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তাহার মত রবাহুতের দল আরও দুই চারিটি করিয়া জুটিতে লাগিল। কেরাণী, স্কুলমাষ্টার, নব্য উকীল প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত! বয়সে সৃষ্টিধরই বোধহয় তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ! দেখিয়া শুনিয়া সৃষ্টিধরের কণ্ঠতালু শুকাইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, না আসিলেই যেন ভাল হইত! তবে কি সে চলিয়া যাইবে? না, যখন আসিয়াছে, তখন শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিয়াই যাইতে হইবে। সে চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল।

সমাগত প্রার্থীদিগের কথোপকথনের মধ্য হইতে সে

বুঝিতে পারিল যে তাহাদিগের অধিকাংশই এম-এ, বি-এ। সৃষ্টিধর ভাবিতে লাগিল,—কি করা কর্ত্তব্য ? অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সকলেই একটু অধীর হইয়াই উঠিয়াছেন। স্কুল, আফিসের বেলা হইয়া যাইতে লাগিল অথচ—

এমন সময় ভৃত্য চালিত চাকা লাগানো ঠেলা-চেয়ারে উপবিষ্ট একজন ভদ্রলোক সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মপ্রার্থিগণ সকলেই তাঁহাকে সম্মানসূচক অভিবাদন প্রদর্শন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া সকলকে উপবেশন করিতে বলিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে তিনি বলিলেন,—"অনেকক্ষণ আপনা-দিগকে ব'সে থাক্‌তে হ'য়েছে। ভারি কষ্ট দিলুম !"

সৃষ্টিধর ভিন্ন সকলেই বোধ হয় সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"বিলক্ষণ ! এ আর কষ্ট কি ?"

গৃহস্বামী ভদ্রলোকটি সহাস্যে বলিলেন,—"কষ্ট নয় ! তবে কি আরাম ? যা'ক বাঁচালেন ! আমি তো সঙ্কোচ বোধ ক'রছিলুম কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি, বোঝেনই তো—অত সকালে ওঠা, ডাক্তারের নিষেধ। আর আমি সাক্ষাতের সময় তো সাড়ে আটটার পরেই লিখে দিয়েছিলুম।"

শুনিয়া একজন দন্তরুচি কৌমুদী বিকশিত করিলেন, —"কি যে বলেন এতে আর সঙ্কোচ কি ?—হুঁ !"

অপর একজন বলিলেন,—"আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, জানেনই তো গরজ বড় বালাই!"

তিনি বলিলেন,—"তা' বটে! আচ্ছা এই খাতাখানায় আপনাদের নাম, ঠিকানা ও লেখাপড়ার সংবাদাদি একে একে সংক্ষেপে লিখে দিয়ে যান! যাঁ'কে আমার প্রয়োজন হ'বে, তাঁ'কে আমি চিঠি লিখে জানা'ব। আমার পক্ষে বেশী কথা বলা ডাক্তারের নিষেধ, সে জন্যে আমি দুঃখিত! বুঝ্‌তেই পারছেন।"

তখন আপন আপন নাম, ঠিকানা প্রভৃতি লিখিবার জন্য কর্ম্মপ্রার্থীদিগের মধ্যে এমন কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল যে বায়োস্কোপের চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট কিনিতেও বোধ হয় অমন কাড়াকাড়ি উপস্থিত হয় না।

সৃষ্টিধর এক কোণে দাঁড়াইয়া অপর সকলের এই অপরূপ কর্ম্মলীলা অবলোকন করিয়া অসহ্য-পুলকে বোধহয় কণ্টকিত হইতেছিল। গৃহকর্ত্তার দৃষ্টি সহসা তাহার উপর নিপতিত হইল। তিনি বালকটির মুখে দেখিবার বস্তু কি পাইলেন বলিতে পারি না, কিন্তু নীরবে এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নাম, ধাম, না লিখিয়াই সহসা সৃষ্টিধর ফিরিয়া যাইবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া তাকাইতেই গৃহস্বামীর

দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি সংলগ্ন হইল। গৃহস্বামী ইঙ্গিতে তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বসিতে বলিলেন।

অতঃপর সৃষ্টিধর ছাড়া উপস্থিত আর সকলেরই যখন লেখা শেষ হইল এবং একে একে তাঁহারা চলিয়া গেলেন তখন সৃষ্টিধর যাইয়া আপন নাম ধাম লিখিয়া 'কোয়ালি-ফিকেশনের' স্থানে লিখিল যে তাহার কোন ডিগ্রি নাই, তবে যে কার্য্যের জন্য লোক প্রয়োজন সে কার্য্যের পক্ষে সে একেবারে অনুপযুক্ত নাও হইতে পারে!

ভদ্রলোকটি সৃষ্টিধরের নিকট হইতে খাতাখানি চাহিয়া লইয়া আর সকলের নাম বাদ দিয়া, শেষের নাম-টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ! এ যে দেখি মুক্তো সাজিয়েছ হে ছোকরা! হুঁ, আচ্ছা একটু শোনাও দেখি,"—বলিয়াই ভদ্রলোকটি তাঁহার বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে বন্ধু, সেই বই দু'খানা নিয়ে আয় তো!"

বন্ধু কর্তৃক অনতিবিলম্বে বই দুইখানি আনীত হইলে বোঝা গেল—বন্ধুটি তাঁহার ভৃত্য!

পুস্তক দুইখানি সৃষ্টিধরের হস্তে অর্পণ করিয়াই বন্ধু চলিয়া গেল।

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"আচ্ছা পড় তো দেখি

শ্রীধর পড়িতে লাগিল......গোটা কতক কথাও তোমার শোনা চাই। [পৃ:—৮৫]

ছোকরা, তুই বই থেকেই কিছু কিছু !”

পুস্তক দুইখানির একখানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, অপরখানি সেক্ষপীয়রের ম্যাক্‌বেথ। তিনি কবিগুরুর “গান ভঙ্গ” শীর্ষক কবিতাটি পড়িতে বলিলেন।

সৃষ্টিধরের বুকটা কেমন দুরু দুরু করিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি ? যথাসাধ্য সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে আড় চোখে এক একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ভদ্রলোকটির দৃষ্টিতে কি বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে নাকি ?

সৃষ্টিধরের পড়া শেষ হইলে ভদ্রলোকটি বলিলেন,— “হুম্ ! আচ্ছা ওখানাও একটু পড় দেখি ভায়া,—যেখানে ইচ্ছে।”

সৃষ্টিধর পড়িতে লাগিল,—

“Out, out brief candle.
Life's but a walking shadow ; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.” ইত্যাদি।

পড়া শেষ হইলে ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"হুম্! তাই বটে! আচ্ছা সে যা'ক! তোমার মত লোকই আমার প্রয়োজন হে, বুঝলে! তোমাকে কাজে বহাল ক'রবার পূর্ব্বে তোমার গোটা কত কথা কিন্তু আমার জানা চাই, আর আমারও গোটা কতক কথাও তোমার শোনা চাই। বুঝলে?"

সৃষ্টিধর বলিল,—"আজ্ঞে।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"আজ্ঞে কি হে? তুমি আমাকে ব'লবে দাদু! আমি তোমাকে ব'লবো নাতি, বুঝলে?"

"আজ্ঞে তা' বুঝেছি। আপনার ভৃত্যও তো আপনার বন্ধু।"

ভদ্রলোকটি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—"আমি লোক চিনি নাতি, লোক চিনি; আমি কখনো ঠকিনি আর আজ ঠ'কবো? তা'কি হয়? নাতির আমার বুদ্ধি আছে। ঠিক ধ'রেছ দেখ্‌ছি। তা' বুঝলে নাতি, ও সত্যি আমার বন্ধু! আমার টাকার অবিশ্যি সীমা সংখ্যা নেই, কিন্তু বন্ধু?—যাক্! আমার কথা পরে হ'বে। এখন তোমার কথা আগে শুনি।"

ভদ্রলোকটির কথার মধ্যে এমন একটা কি যেন

সম্মোহিনী শক্তি ছিল যে ধীরে ধীরে এক এক করিয়া তিনি সৃষ্টিধরের জীবনের সমস্ত কথাই বাহির করিয়া লইলেন। তিনি সৃষ্টিধরের যেন একজন পরম সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। শেষ পর্য্যন্ত সৃষ্টিধর তাঁহার কথায় একেবারে বিস্মিত স্তম্ভিত ও রুদ্ধবাক না হইয়া পারিল না। ভদ্রলোকটি নিজের জীবনের অনেক কথাই সৃষ্টিধরকে খুলিয়া বলিয়া অবশেষে বলিলেন,—"আচ্ছা নাতি, তবে ঐ কথাই রইল। তোমার মাহিয়ানা আপাততঃ এক শতই স্থির হ'ল। না, না, ওর কমে হয় না। যদি কখন অসন্তুষ্ট হই ? আরে তখন তো একেবারে তাড়িয়েই দোব হে ! কমিয়ে আবার কি দোব ?"

সৃষ্টিধর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"কিন্তু অতো তো আমি আশা করি নি।"

ভদ্রলোকটি হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন,—"কি তবে অশা ক'রেছিলে ? জমিদার কুবের সিংহ, সারা মাস খাটিয়ে নিয়ে কুড়ি টাকা মাইনে দেবে ! দেখ হে ছোকরা তুমি আমাকে অপমানিত ক'রছো,—বুঝতে পারছো না। হাঁ একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি,—রাগলে কিন্তু আমার জ্ঞান থাকে না। তখন যা' খুশী মুখ দিয়ে কিন্তু যা'র হয়। হুঁ !"

স্বষ্টিধর বলিল,—"তা' হ'লে তো আমার পোষাবে না। আত্মসম্মান তো আমি বিক্রি ক'রতে পারবো না—তা' ও একশো টাকা হ'লেও নয়।"

ভদ্রলোকটি মহাউৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন,—"ব্রাভো, সাবাস! এই তো চাই নাতি! আত্মসম্মান খোয়াবে কেন? যদি বোঝ আমি যা' খুশী অন্যায় বল্‌ছি, তুমিও যা' খুশী ব'ল্‌বে। তা' হ'লেই আমি বুঝ্‌বো যে আমি রেগেছি—অন্যায় ক'রছি—বুঝ্‌লে?"

স্বষ্টিধর বলিল,—"তা' তো বুঝ্‌লুম্ কিন্তু—"

"আর কিন্তু নয়। ওই কথাই রইল। কথা বাড়িও না। আমি অসুস্থলোক। ডাক্তার আমাকে বেশী কথা কইতে নিষেধ ক'রেছেন তা' জানো, তবুও কথা বাড়াচ্ছো। তোমার অন্যায় হচ্ছে না? হাঁ, আর একটা কথা—তোমার ও বাড়ী ব'দ্‌লে ফেল। ভাল ক'রে পড়াশুনা ক'রো কিন্তু নাতি! চাকরী ক'রতে এসে যেন আখের খুইয়ো না, তা' ব'লে রাখ্‌ছি!"

স্বষ্টিধর সহাস্যে এইবার ভদ্রলোকটির পদধূলি লইল। স্বষ্টিধরের চোখের সম্মুখে স্বষ্টি কি একদিনে বদলাইয়া গেল নাকি। এমন অদ্ভুত ব্যাপারও কি জগতে সম্ভব। কাল স্বষ্টিধর ভাবনায় চিন্তায় একেবারে অভিভূত হইয়া

গিয়াছিল, আর আজ এক মূহূর্ত্তে সে যেন আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ প্রাপ্ত হইয়াছে মনে হইল। পৃথিবী যে এত সুন্দর,—সে যেন তাহা কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই। বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট ঐ যে বায়সেরা কলরব করিতেছে, তাহাও যেন কোকিল পাপিয়ার ঐক্যতান বলিয়াই তাহার নিকট অনুভূত হইতেছে। এই সুখ সৌভাগ্যের কথা, সে মাকে জানাইবার জন্য ছুটিয়া চলিল। পথ যেন আর ফুরাইতেই চাহে না! এতক্ষণে মনে পড়িল কলেজে যাইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাতা তাহার অদর্শনে, না জানি কতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিধরের জীবনে এখন আর কোন দুঃখই নাই। এখন তাহারা মায়ে পোয়ে অতিরিক্ত সচ্ছলতার মধ্যেই বাস করিতেছে। আগেকার বাসা বদলাইয়া এখন তাহারা একটা ভাল বাসায় উঠিয়া আসিয়াছে। এত কষ্টের পর এতখানি সুখ ও সুবিধা, প্রথম প্রথম যেন তাহাদিগের বরদাস্ত হইতেছিল না। এখন ক্রমে ক্রমে সহিয়া আসিয়াছে।

মাসে মাসে অনেকগুলি টাকা হাতে আসায় সৃষ্টিধরের মাতার একটা সুবিধা এই হইয়াছে যে তিনি ইচ্ছামত গরীব, দুঃখী, ভিখারীকে দান করিতে সমর্থ হইতেছেন। মুষ্টি-ভিখারীর ভিড় তো তাঁহার বাসায় দিবারাত্র লাগিয়াই আছে। পাড়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন প্রভৃতিকেও মাঝে মাঝে বারব্রত প্রভৃতিতে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়া তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। ইহার অপেক্ষা অধিক

সুখ আর কি থাকিতে পারে, তাহা তিনি অবগত নহেন।

স্বষ্টিধরের চাকুরীতো এক মজার ব্যাপার। তাহাকে চাকুরী না বলিয়া শিক্ষকের নিকট পড়িতে যাওয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রভু কুবেরবাবুর নিকট দুইদিন যাইয়াই স্বষ্টিধর বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিল যে তিনি একজন পাণ্ডিত্যের জাহাজ বিশেষ। জ্ঞান-ভাণ্ডারের কোন দ্বারই বোধহয় তাঁহার নিকট বন্ধ নাই। তিনি জানেন না, এমন বিষয়ই যেন কিছু নাই! প্রথম প্রথম কোন একখানি বই লইয়া দুই চারি ছত্র পাঠ করিবার পরই, পঠিত বিষয়ের কোন একটা কথা লইয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সেই বিষয় লইয়া নিজেই এমন আলোচনা করিতেন যে স্বষ্টিধর আর পাঠে অগ্রসর হইবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হইত না। ভদ্রলোকটির আলোচনা শুনিয়াই বিস্মিত হইয়া চলিয়া আসিত।

একদিন কুবের বাবু স্বষ্টিধরকে বলিলেন,—“তোমার পড়বার বইগুলো এক একখানা এনে আমাকে প'ড়ে শুনিও না নাতি! দেখি যদি ফাঁকতালে বি-এ পাসের জ্ঞানটা লাভ ক'রতে পারি।”

স্বষ্টিধর সহাস্যে অথচ সঙ্কোচের সহিতই উত্তর দিল,

—"কি যে বলেন দাছু, আপনি অনেক বি-এ, এম্-এর নাক কান কেটে দিতে পারেন!"

"পারি নাকি? তা' হ'লে আমার নাতির নাক কানও একদিন নিশ্চয়ই কাট্‌বো—দেখে নিও। বাজে কথা এখন রেখে, কাল থেকে তোমার পড়ার বই এনে, একে একে সবগুলি শোনাবে—বুঝ্‌লে? মনে থাকে যেন ভুলো না।"

সৃষ্টিধর নত মস্তকে স্বীকার করিল যে সে ভুলিবে না, আনিবে; এবং তাহার পর হইতে রোজ রোজ সে তাহার পাঠ্য পুস্তক আনিয়া ভদ্রলোককে শুনাইতে লাগিল, অর্থাৎ শুনাইতে যাইয়া নিজেই এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল যে বিস্ময়ের আর তাহার অবধি রহিল না।

কুবের বাবু কি কখন কোন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন না কি? তাহা হইলে কি তিনি এমন করিয়া আপনাকে গোপন রাখিতে পারিতেন? দেশ জুড়িয়া তাঁহার নামের তুন্দুভিনিনাদ এতদিন নিশ্চয়ই বিঘোষিত হইত। তবে কি?—"Full many a flower is born to blush unseen."? নিজে না বলিলে তো ভদ্রলোকটির নিকট হইতে কোন কথাই বাহির করিবার উপায় নাই।

যাহা হউক সৃষ্টিধরের চাকুরী কিন্তু মন্দ চলিতেছে না। লোকে টাকা খরচ করিয়া শিক্ষক রাখে আর সৃষ্টিধর টিউটারের নিকট পড়িয়া শুনিয়া মাসান্তে শত মুদ্রা পকেটস্থ করিয়া ফিরিয়া আসে। উল্টো রাজার মজার দেশেও বোধ করি এমন ব্যাপার সম্ভব হয় না। তবু তাহা কিন্তু হইতে লাগিল।

ভদ্রলোকটির অসুখ বিসুখও তো সৃষ্টিধর বিশেষ কিছুই দেখিতে পায় না! তবে ডাক্তার প্রত্যহই আসিয়া থাকেন এবং ভদ্রলোকটি চাকা লাগানো চেয়ারে চড়িয়া এঘর ওঘর ঘোরা ফেরা করেন—ইহাই যদি অসুখ হয় তবে তিনি অসুখে একেবারে যে কুপোকাৎ সে বিষয়ে আর সন্দেহের কি-ই বা অবকাশ থাকিতে পারে?

সৃষ্টিধর ভাবে—প্রতিভাবান মহৎ ব্যক্তির অনেকেরই নানারূপ অদ্ভুত খেয়াল থাকিতে দেখা ও শোনা যায়—ইহা কি তাহাই নাকি?—কে জানে?

ভদ্রালোকের নিকট হইতে মাসে মাসে অনর্থক টাকা লইতে কিন্তু সৃষ্টিধরের বিবেক আহত হয়। সে কথার উল্লেখ করিলে ভদ্রলোক সমগ্র 'দন্তরুচি' বিকশিত করিয়াই উত্তর দেন,—"এতখানি বয়েস হ'ল,—আমার নিজের ভাল মন্দ আমি নিজে কিছুই বুঝি না, আর তুমি

কাল্‌কের ছেলে হয়ে আমার চেয়ে খুব বেশী বোঝ না কি হে ছোকরা? কলিকাল আর ব'লেছে কা'কে? তোমার যদি এতই বিবেকের দংশন উপস্থিত হ'য়ে থাকে বাপু, তা' হ'লে—একলব্যের মত আঙ্গুল কেটে নয়—কান দু'টো কেটে দিয়েই একদিন না হয় গুরু দক্ষিণা দিয়ে দিও। তা' হ'লেই শোধ বোধ হ'য়ে যা'বে; কি বল?"

সৃষ্টিধর আর কি বলিবে? সে নত মস্তকে প্রভুর কথাগুলি শুনিয়া যায় আর ভাবে,—এমন মানুষও তা' হ'লে পৃথিবীতে সম্ভব। জগৎ তাহা হইলে কেবল মাত্র দৈত্য দানবেই পূর্ণ নহে? এখানে দেবতাও আছেন?

কুবের বাবুর প্রতি সৃষ্টিধরের ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন ক্রমশ বাড়িয়াই চলে। ভদ্রলোকটির প্রতি তাহার অনুরাগ এখন এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বোধহয় তাহাকে এখন বিতাড়িত করিলেও সে আর চলিয়া যাইতে পারিবে না।

সৃষ্টিধর তো একে নিজেই একজন তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন অধ্যবসায়ী বালক, তাহার উপর কুবের বাবুর সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় সে ইহার পর যতগুলি পরীক্ষা দিল তাহাতে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় তো হইলই না বরং

পরীক্ষায় এমন সব নম্বর পাইয়া পাস করিতে লাগিল যে, তত নম্বর পরে আর কেহ পাইবে কিনা তাহা বলা যায় না ; তবে তাহার পূর্ব্বে আর কেহ কখনও অত নম্বর পায় নাই।

চারিদিকে একেবারে টিটি পড়িয়া গেল,—"হাঁ, এতদিনে একটা ছেলের মত ছেলে বাহির হইয়াছে বটে !"

দশম পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিধরের লেখাপড়া মোটামুটি একরকম শেষ হইয়াছে। এখন সে একজন এম-এ, বি-এল। শেষের পরীক্ষাগুলি সে এমনভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে যে লোকে যে সকল মোটা বেতনের ভাল ভাল চাকুরীর স্বপ্ন দেখে, তাহা আর এখন তাহার নিকট মোটেই স্বপ্ন নহে, চেষ্টা করিলেই বোধ হয় সে তাহা হস্তগত করিতে পারে।

এখন তাহার কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সৃষ্টিধর একদিন কুবেরবাবুর পরামর্শ ও অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"দেখ নাতি, 'তোমার লেখাপড়া শেষ হ'য়েছে'—এ যেন মনে ক'রো না। বরং এখন থেকেই তোমার লেখাপড়া প্রকৃত আরম্ভ হ'বে। জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত! তা'র কতটুকুই বা মানুষ আয়ত্ত ক'রতে সমর্থ! নিউটনের সেই অমর কথা,—'জ্ঞান মহাসমুদ্রের তীরে ব'সে, আমি কেবলমাত্র উপলখণ্ড সংগ্রহ ক'রেছি;

এখনও সমুদ্রে নামা হ'য়ে ওঠে নি।'—জান তো! সুতরাং এখানেই লেখাপড়া 'ইতি শেষ' ক'রলে তোমার চ'ল্‌বে না ভাই, সারাজীবন তোমাকে জ্ঞানার্জ্জন ক'রতে হ'বে, সুতরাং এমন পেশা তোমাকে গ্রহণ ক'রতে হ'বে যা'তে এই জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা তোমাকে জলাঞ্জলি দিতে না হয় বরং তা'র সুযোগ পাওয়া যায়। আমার ইচ্ছা, তুমি অধ্যাপনার পবিত্র কার্য্য গ্রহণ কর, তা'তে অর্থ অবশ্য কম পাওয়া যাবে কিন্তু অর্থই মানবের একমাত্র চরম ও পরম পদার্থ নয়! অর্থ না হ'লে মানুষের জগতে চলা অসম্ভব সত্য, তাই সৎপথে থেকে যথাসম্ভব অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে হ'বে কিন্তু তাই ব'লে অর্থকেই জীবনের একমাত্র তপস্যা যেন ক'রে ব'সো না ভায়া, এই আমার অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশ, কামনা,—যা' বল তাই।"

সৃষ্টিধর নত হইয়া কুবেরবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলে, কুবেরবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"এইবার তোমার কান দু'টো কেটে যে গুরুদক্ষিণা চাই ভাই, দেবে কি?"

সৃষ্টিধরও সহাস্যেই বলিল,—"বলেন তো হাত, পা, চোখ, নাক,—সবই কেটে দিতে পারি, কান তো সামান্য কথা। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আপনি, আমাকে কৃতজ্ঞতা দেখাবার এতটুকু সুযোগ দিলেও যে

আমি কত খুশী হই' তা' আর আমি ব'লে কি বোঝাব !''

"বটে ! বটে !! শুনে' খুব খুশী হলুম ভাই, এজগতে পার হ'য়ে পাটনীকে গালাগাল দেওয়াই যে রীতি ! কিন্তু তুমি দেখ্‌ছি সৃষ্টিছাড়া ভিন্ন জীব ! সে যাক্—তুমি যদি সত্যই কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাক তবে একদিন আমাকে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, আচ্ছা ক'রে মায়ের চমৎকার রান্নাটা একবার খাইয়ে দাও—বুঝ্‌লে ! আমি কিন্তু ভারি-ই ঔদরিক ! ডাক্তারেরা বলেন—সেই জন্যেই নাকি আমার রোগ সারছে না।"

সৃষ্টিধর হাসিতে লাগিল। কুবেরবাবু বলিলেন,—"কি, রাজি তো ? মুখে কথা নেই যে।"

সৃষ্টিধর উত্তর দিল,—"আমি এসে আপনাকে মাথায় ক'রে নিয়ে যা'ব। কবে যাবেন বলুন ?"

"যেদিন তোমার ইচ্ছে। তবে মাথায় চ'ড়ে যেতে পারবো না ভাই, রাস্তায় লোকে বড় ঠাট্টা ক'রবে। তা'র চেয়ে মোটারে চ'ড়েই যা'ব, কি বল ?"

"তবে এখনই চলুন।"

কুবেরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—"যত বোকা আমাকে মনে কর ভায়া, তত বোকা আমি

মোটেই নই ; আজকে নিয়ে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে সারবে তো ! ব'লবে,—'তাড়াতাড়ি বেশী কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারি নি, মাপ্‌ ক'রবেন !' এই তো ? ওতে আমি রাজি নই নাতি, তাড়াতাড়ি ক'রতে চাও, বেশ ! কালকেই যাব। কাল দিনটাও ভাল আছে। সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী। জানই তো সুদিন-সুক্ষণ ছাড়া আমি 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।' আচ্ছা তা' হ'লে ওই কথাই রইল, কি বল ?"

"আমি আর কি ব'লবো ? আমি শুধু ভাব্‌ছি—আপনার দয়ার কথা।"

কুবের বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ, এ-বিষয়ে আমার অসীম দয়া ; আমি একেবারে করুণার সাগর, দয়ার অবতার বিশেষ ! কেউ খেতে ডাকলে, কেমন যেন আমার দয়ার দেহ, জান নাতি, আমি কিছুতেই 'না' ব'ল্‌তে পারি না। 'ডাক্তারগুলো কেবল ঠকিয়ে ঠকিয়ে আমাকে এই দয়া দেখাতে বারণ করেন। কি অন্যায় বল তো, নইলে এমন দয়া আমি সুদিন-সুক্ষণ পেলে প্রতিদিন দেখাতে রাজি ছিলাম হে !"

সৃষ্টিধর নীরবে হাসিতে লাগিল। কুবের বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, এখন বাড়ী যাও ভায়া, তোমার তো আর ডাক্তারের নিষেধ নাই, তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে

স্নান ধ্যান ক'রে একটু ক'ষ্ট ক'রেই না হয় দয়া দেখাও গে, যাও না। মা হয়ত আবার কত ভাব্‌ছেন।"

সৃষ্টিধর হাসিয়া বলিল,—"না, তিনি ভাব্‌বেন না। আমি যে এখানে এসেছি তা' তিনি জানেন। তিনি আরও জানেন, আমি যে দয়া দেখাই তা' আপনারই অনুগ্রহে। সুতরাং আমার দয়া প্রদর্শনের প্রয়োজন হ'লে, আপনিই তা'র ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, তা' তাঁর অজানা নেই।"

"না, না, না, তা' হ'বে না, সে বিষয়ে আমি ভারি নির্ম্মম, তাঁ'কে জানিও। যত দয়া সব আমিই দেখাব, তুমি এখানে কেন দয়া দেখাবে বাপু! এখন তুমি স'রে পড়। যা'তে কাল আমি দ্বিপ্রহরে ভাল ক'রে দয়া দেখাতে পারি, তা'রি ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি অসুস্থ মানুষ, আমাকে বেশী বকিও না, বুঝলে?"

সৃষ্টিধর কুবের বাবুর পদধূলি লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিধর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! সপুত্র খুড়া খুড়ী আসিয়া হাজির হইয়াছেন। এতদিন পরে সহসা তাঁহাদের গঙ্গা স্নানে পুণ্য সঞ্চয় করিবার সখ যে কেন হইল তাহা বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। মাতা তাঁহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এতক্ষণে সৃষ্টিধরকে দেখিয়া তিনি যেন অকূলে কূল পাইলেন। এতদিন পরে এই সুখের সময়ে সৃষ্টিধর, খুল্লতাত প্রভৃতিকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশীই হইল। সে ভক্তি সহকারেই খুড়া মহাশয় ও খুড়ীমার পদধূলি গ্রহণ করিল।

খুল্লতাত বলিলেন,—"বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক! বংশের মুখ উজ্জ্বল কর!"

খুড়ীমা কহিলেন,—"হুঁ!"

মাতা বলিলেন,—"তোমার কাকা কাকীদের গঙ্গা

নাইবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও বাবা, একখানা গাড়ী ডাকো।"

সৃষ্টিধর বলিল,—"এত তাড়াতাড়ি কি মা, এই তো সবে এলেন। তুই একদিন যা'ক্ না! তারপর যত খুশী গঙ্গাস্নান ক'রবেন। তা' ছাড়া কালীঘাট, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, প্রভৃতি কত কিছুই তো দেখ্‌বার আছে। সব দেখ্‌বেন, শুন্‌বেন। এতদিন পরে যদি পায়ের ধূলো দিয়েছেনই তখন তো আর সহজে ছেড়ে দিচ্ছি নি!"

মাতা বলিলেন,—"আমিও তো তাই বলি! তোর কাকীমা যে কিছুতেই শুন্‌বে না। ব'ল্‌ছে 'কালই চ'লে যা'ব'।"

সৃষ্টিধর বলিল,—"তা' কি হয় কাকীমা, তা' হয় না! আর তা' ছাড়া কাল তো হ'তেই পারে না। শুন্‌ছো মা, কুবেরবাবু দয়া ক'রে কাল আমাদের এখানে খাবেন ব'লেছেন। কাকীমা যখন এসেছেনই তখন গোটা কতক ভাল ভাল রান্না তাঁ'কেও ক'রতে হ'বে কিন্তু! কি বল মা!"

খুড়িমা চটিয়া উঠিলেন,—"হুঁ! এতদিন পরে তোমা-দের এখানে রাঁধুনীগিরি ক'রতেই তো এসেছি! তবে তা' এখন তোমরা ব'লতে পার।"

সৃষ্টিধরের মাতা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কুবেরবাবু বিদুরের ক্ষুদ্ কুড়ো খাবেন ব’লেছেন।” সৃষ্টিধরের খুল্লতাত-পত্নীর এবার অধিকতর আশ্চর্য্য হইবার পালা আসিল। তিনি বলিলেন,—“খাবেন না। তোমরা যে এখন রাজা গো, রাজার বাড়ী কেউ না খেয়ে পারে? কেন তোমরা কি কিছুই জান না। ওমা হবে কি? বলে,—‘যা’র বিয়ে তা’র খোঁজ নেই, পাড়া পড়সির ঘুম নেই।’ এ যে হ’ল তাই। আমরা সেখান থেকে সব জানি। তোমরা কি আর কিছুই জান না? জান নিশ্চয়ই।”

সৃষ্টিধরের মাতা বলিলেন,—“কি ব’ল্ছো ভাই, কিছুই তো বুঝতে পারছি নি! আমাদের তো কিছুই জানা নেই।”

“ওমা, বলে কি! সত্যি?”

এইবার সৃষ্টিধরের খুল্লতাত মহাশয় পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া মুখ খুলিলেন,—“আঃ! থামো ছোট বউ, থামো, তোমার পেটে যে একটি কথাও প’চতে পায় না দেখতে পাচ্ছি। একটু পরে স্নান খাওয়া সেরে ধীরে সুস্থে ব’ল্লে কি আর চ’লতো না? সে সব ওবেলা শুনো বৌদি। এবেলার কাজগুলো এখন এবেলা সারতে

অতঃপর শুভদিনে······শুভ-পরিণয় সমাধা হইয়া গেল। [পৃঃ—১০৮]

দাও। গঙ্গাস্নানের হ্যাঁপা-ট্যাপায় আজ আর দরকার নেই। যখন ভাইপোর বাড়ী এসেছি তখন কিছুদিন থাকবো বৈ কি।

সৃষ্টিধরের খুড়ীমাও এবারে বিশেষ কিছু আপত্য করিলেন না। বোধহয় বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও ক্ষুধার জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

কথাটা যাহা হউক তখনকার মত চাপা পড়িল। অতঃপর বাসার সকলকার স্নানাহার মিটিলে যখন তাহারা দিবানিদ্রার সদিচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করিলেন তখন সৃষ্টি-ধরের মাতা তাঁহার নিজের জন্য এক মুষ্টি আতপ তণ্ডুল ফুটাইয়া লইবার জন্য 'হবিষ্যি-ঘরে' প্রবেশ করিলেন। তিনি উনুন ধরাইয়া তাহাতে হাঁড়ী চড়াইয়াছেন এমন সময় তাঁহার স্নেহময়ী 'জা'কে' তথায় আসিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে একখানি পিঁড়ি আগাইয়া দিয়া বলিলেন, —"বসো ভাই, বসো! তা' একটু গড়িয়ে নিলে না যে!"

জা উত্তর দিলেন,—"গড়াব আবার কি? দিনে ঘুমুলে আবার রাত্তিরে ঘুম হয় না আমার তাই ভাবলুম যে কথাটা তখন শেষ হয় নি, সেটা শেষ ক'রেই আসি।" —বলিয়াই কথাটা আনুপূর্ব্বিক তিনি বিশদ করিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথাটা শেষ হইলে ব্যাপারটা

বিশেষ ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া সৃষ্টিধরের মাতা বলিলেন, —"ভগবানের অনন্ত করুণা!"

"এই করুণা তো তিনি অনেক আগেই দেখাতে রাজি ছিলেন কেবল তোমার জন্যই তো তা' পারেন নি!"

"সেও তাঁ'রই ইচ্ছা বোন্!"

"আমরা কেবল তোমাদের মন্দর চেষ্টাতেই ফিরি কিনা।"

"এমন কথা আমি কখনও মনে করি নি ভাই!"

অতঃপর দুই জায়ের কথা নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। চলুক! সেই ফাঁকে আমরা উপর্যুক্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে প্রকাশ করি।

কুবের বাবু যে একজন প্রকাণ্ড জমিদার তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানি। কিন্তু সৃষ্টিধরদের গ্রামের যে জমিদারের কন্যায় পূর্ব্বে সৃষ্টিধরের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল সেই জমিদারই যে কুবের বাবুর জামাতা, তাহা সৃষ্টিধরের মাতা বা সৃষ্টিধর কেহই জানিত না। এখন সৃষ্টিধরের মাতা, জায়ের নিকট তাহা জানিতে পারিলেন।

কন্যা, জামাতা ও তাঁহাদিগের এক পুত্র ও এক কন্যা ভিন্ন জগতে কুবের বাবুর আপনার বলিতে স্নেহের বন্ধন

আর কেহ নাই। সৃষ্টিধরের পরিচয় পাইয়া তাহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য, তাঁহার সেই পরমা সুন্দরী দৌহিত্রীকে এখনও তিনি অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। তাঁহার দৌহিত্রীও এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। এইবারে সৃষ্টিধরের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া কুবের বাবু, সৃষ্টির নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা আদায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাই জামাইকে লিখিয়া, সৃষ্টিধরের খুল্লতাতকে তিনিই কলিকাতায় আনাইয়াছেন। সৃষ্টির খুল্লতাত পত্নীও এই সুযোগে গঙ্গায় ডুবটা দিয়া যাইবেন মনে করিয়া স্বামীর সঙ্গে আসিয়াছেন। সৃষ্টিধর কিন্তু একদিনের নিমিত্তও বুঝিতেও পারে নাই যে কুবের বাবু তাহাদের গ্রামের জমিদারের শ্বশুর। কুবের বাবুকে তো সে কখনও তাহাদের গ্রামে দেখে নাই। কুবের বাবু কিন্তু সৃষ্টিধরের মুখে তাহার নাম, ধাম প্রভৃতি সকল সংবাদ পাইয়াই প্রথম দিনেই তাঁহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাকে যোগাযোগ বা ভবিতব্য—কি বলে ?

পরদিন খাইতে আসিয়া ভোজন ক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা করিয়া কুবেরবাবু সৃষ্টিধরের খুল্লতাতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—খাওয়া তো হ'ল! এবার মাকে

ভোজন দক্ষিণাটা ফেলে দিতে বলুন চ'লে যাই ; নইলে কিন্তু উঠবো না।

খুল্লতাত বলিলেন—চলে আপনাকে যেতে হ'বে না কিন্তু ভোজন দক্ষিণা আপনি আপনার ইচ্ছামতই পাবেন। বৌদির হয়ে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

তারপর হলধর বাবুর মারফৎ স্বষ্টিধরের মাতার সহিত কথা চালাইয়া কুবেরবাবু, দৌহিত্রীর বিবাহ, স্বষ্টিধরের সহিত পাকাপাকি করিয়া লইলেন। তিনি সেই দিনই একখানা খামে মোড়া কাগজ দিয়া স্বষ্টিধরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন! স্বষ্টিধরকে বিবাহের অগ্রে খামখানি খুলিতে তিনি নিষেধ করিলেন।

অতঃপর শুভদিনে, শুভক্ষণে কুবেরবাবুর দৌহিত্রীর সহিত মহাসমারোহে স্বষ্টিধরের শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

'দীয়তাং ভুজ্যতাং'এর সীমা পরিসীমা রহিল না।

কথায় বলে,—"হুঁ হুঁ দত্তাৎ, না হুঁ দত্তাৎ, ন দত্তাৎ ব্যাঘ্র ঝম্পনং।" তা' না না না করিয়া ব্যাঘ্র-ঝম্পের দ্বারা সকলেই দয়া দেখাইয়া গেলেন।

অবশেষে বিবাহের সমারোহ একদিন শেষ হইলে স্বষ্টিধর, কুবের বাবুর প্রদত্ত খামখানি খুলিয়া পাঠ করিয়া

জানিল, কুবের বাবু তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দৌহিত্রী ও সৃষ্টিধরকে সমান অংশে উইল করিয়া দান করিয়া ছেন।

উক্ত উইল পাঠেই জানা গেল যে কুবের বাবুর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ যাহা সৃষ্টিধরের প্রাপ্য হইবে, তাহা নাকি—

পুরুষকারের পুরস্কার